নারী উন্নয়নে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) এর কর্মসূচী ও কার্যকারিতা : একটি মূল্যায়ন

GIFT

শিরিন আক্তার মজুমদার

401329

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library

401329

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আগস্ট, ২০০৩

নারী উন্নয়নে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) এর কর্মসূচী ও কার্যকারিতা : একটি মূল্যায়ন

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রীর আংশিক পরিপূরক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

401329

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

আগস্ট, ২০০৩

(শিরিন আক্তার মজুমদার)

রেজিস্ট্রেশন : ৫০৯/৯৭-৯৮

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদনপত্র

শিরিন আক্তার মজুমদার কর্তৃক নারী উন্নয়নে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) এর কর্মসূচী ও কার্যকারিতা : একটি মূল্যায়ন - শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা'য় উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হলো।

আগস্ট, ২০০৩

(ড. নাজমা চৌধুরী)
অধ্যাপক, উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ
এবং
প্রাক্তন অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

401329

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা ও মা এবং আমার

একমাত্র স্নেহাস্পদ পুত্র মোঃ সাফওয়ান জারিফকে

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে কোন গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য সরবরাহে অপারগতা, অনীহা ও দোদুল্যমানতা এবং গবেষণা কাজে আর্থিক অনুদানের সুযোগ সীমিত বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত সেখানে সফলতার সাথে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা আরো কঠিন ব্যাপার। তারপরও বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তত্ত্বাবধায়ক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকমন্ডলী যে সাহায্য, পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

গবেষণা কর্মটি পরিচালনার কাজে যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান, উপদেশ, নির্দেশ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী। তাঁর অকৃত্রিম সহযোগিতা ও উৎসাহ না পেলে গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা আদৌ সম্ভব হতো না। এজন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমি আমার বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছি আন্তরিক সহযোগিতা। আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যে সব সংগঠন থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পেয়েছি তার মধ্যে অন্যতম হলো উইমেন ফর উইমেন। এই সংগঠন থেকে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন জার্নাল, সাময়িকী ও বিভিন্ন ধরনের পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে যে অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছি সেজন্য আমি উইমেন ফর উইমেন কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়া এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) এর উপমহাব্যবস্থাপক (তথ্য) ড. মোস্তাক আহমেদ এবং মানব সম্পদ বিভাগের সৈয়দ ফয়সাল উদ্দিন হোসেনও আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। কেননা তাঁরা তাঁদের কর্মব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণা প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং 'আশা'র উপর প্রকাশিত বিভিন্ন মূল্যায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেদন সরবরাহ করেছেন যার মাধ্যমে 'আশা' সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভে সক্ষম হয়েছি যা গবেষণা কাজে ব্যবহার করেছি। এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ব্র্যাক এর গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, উইমেন ফর উইমেন এর গ্রন্থাগার, গ্রামীণ ট্রাষ্ট গ্রন্থাগার ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা কর্মটি পরিচালনায় প্রতিটি স্তরে উৎসাহ উদ্দীপনা দান করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা আলহাজ্জ আব্দুস সোবহান মজুমদার, মা আলহাজ্জ আয়েশা সোবহান এবং বড় ভাই সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক ড. আবুল কাসেম মজুমদার। এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার জীবনসঙ্গী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব বিজনেস, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, যার সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা কর্ম আমার পক্ষে করা সম্ভব হতো না। এজন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি গবেষণা কর্মটি পরিচালনার জন্য বিভাগীয় সেমিনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ব্যবহার করতে দেয়ার জন্য আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া, গবেষণা থিসিসটি কম্পিউটার কম্পোজে বিশেষভাবে সহায়তা করার জন্য জনাব মোঃ আব্দুল মতিনকে জানাই ধন্যবাদ।

আগস্ট, ২০০৩

(শিরিন আক্তার মজুমদার)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		ভূমিকা	০১
	১.১	গবেষণা প্রস্তাবনার গুরুত্ব	০১
	১.২	গবেষণা পরিচালনা পদ্ধতি	০৭
	১.৩	গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৮
	১.৪	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১০
	১.৫	গবেষণা পর্যালোচনা	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়		গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো	২৭
	২.১	উন্নয়ন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণা	২৭
	২.২	উন্নয়ন কৌশল ধারণার ক্রমবিবর্তন	৩৫
	২.৩	উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান	৪৬
	২.৪	নারী উন্নয়নের গুরুত্ব	৫১
তৃতীয় অধ্যায়		বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের ধারা	৫৯
	৩.১	সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ	৬০
	৩.২	আন্তর্জাতিক বিশ্বে নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচী	৬৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়	**বাংলাদেশে এনজিও'র ভূমিকা**	**৮১**
	৪.১ বাংলাদেশে এনজিও'র কর্মকাণ্ডের বর্ণনা	৮২
	৪.২ নারী উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা	৯৩
পঞ্চম অধ্যায়	**এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা): কর্মকাণ্ড ও পরিচিতি**	**১০৫**
	৫.১ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা)-এর উৎপত্তি	১০৬
	৫.২ নারী উন্নয়নের জন্য "আশা" কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ	১১১
	৫.৩ আশা'র নারীর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন	১২৯
	৫.৪ এডাব, জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটি এবং আশা'র সম্পর্ক	১৩৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	**উপসংহার**	**১৪৫**
গ্রন্থপঞ্জি		**১৬৪**

Dhaka University Institutional Repository

Abbreviation :

CEDAW	:	Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women
CRC	:	Convention on Child Rights
GAD	:	Gender and Development
GDP	:	Gross Domestic Product
NGO	:	Non Government Organization
GNP	:	Gross National Product
GO	:	Government Organization
WAD	:	Women and Development
WID	:	Women in Development
WOPA	:	World Plan of Action

Dhaka University Institutional Repository

টেবিলের তালিকা

		পৃষ্ঠা নম্বর
১।	ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ	৪৯
২।	প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অবস্থান	৫০
৩।	নারী উন্নয়নে সরকারী ব্যয়ের চালচিত্র	৬৪
৪।	আশা'র তহবিলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎস	১০৮
৫।	আশা'র প্রধান প্রধান দিকের সার্বিক পরিসংখ্যান	১০৯
৬।	আশা' কর্তৃক পরিচালিত ঋণদান কার্যক্রমের আওতাধীন গ্রাম, সদস্য সংখ্যা, গ্রুপ সংখ্যা এবং সঞ্চয়	১২১
৭।	আশা'র কর্তৃক অবমুক্তকৃত ঋণ সংক্রান্ত বিবরণ	১২৬
৮।	আশা'র আয়ের বিবরণ	১২৭
৯।	আশা'র খাতওয়ারী ব্যয়ের বিবরণ	১২৭
১০।	আশা'র সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচীর পারফরমেন্স	১২৮
১১।	আশা'র সঞ্চয়, ঋণ ও ঋণ গ্রহীতার সংখ্যাগত বিবরণ	১৩২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলাদেশের নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সমাজ কাঠামোর প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। ফলে সমাজে তারা বিভিন্নভাবে অবহেলিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও তারা কোন ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায়নি। অথচ এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে যদি উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যেতো তবে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়তো জাতীয় অর্থনীতিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে। উন্নত বিশ্বসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের মত বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। স্বাধীনতা লাভের পর এ লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হলেও নারী উন্নয়নের গুরুত্ব এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীকে সম্পৃক্ত করতে আশানুরূপ সমর্থ হয়নি। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জাতীয় সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা নারী উন্নয়ন বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং নারীকে কিভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যায় সে লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন শুরু করে। বর্তমানে বলা চলে যে, প্রায় প্রতিটি এনজিও'র কর্মকান্ডই কম-বেশি নারী কেন্দ্রিক। কেননা সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি ব্যাপক অংশ নারী। এদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্য নিয়েই অনেক এনজিও বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করছে। এদের মধ্যে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) একটি অন্যতম এনজিও যা বর্তমান গবেষণা কর্মের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

১.১ গবেষণা প্রস্তাবনার গুরুত্ব

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। দীর্ঘদিনের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও শৃংখলিত অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় পাকিস্তানী শাসন-শোষণের শিকার হয়। প্রায় দুই দশকেরও অধিককাল পাকিস্তানী শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এবং সবশেষে দীর্ঘ নয় মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের শেষ দিকে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠন ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার বা জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এসব কর্মসূচীর আশানুরূপ সফলতা অর্জিত না হওয়ায় বাংলাদেশের জাতীয় সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং উন্নয়নধর্মী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা শুরু করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতো। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, উন্নত বিশ্ব ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য সহযোগিতাও সরকার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারার কারণে প্রত্যাশিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। সরকারের এ ধরনের ব্যর্থতার ফলে এসব উন্নয়ন সংস্থা ও সাহায্য দাতা দেশসমূহ দেশের উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে জাতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর পাশাপাশি বিকল্প হিসেবেই এনজিওদের বেছে নেয় এবং তাদের মাধ্যমে সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী দ্বারা দেশের সার্বিক উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়। ফলে বাংলাদেশে এনজিও'র কার্যক্রম মূলতঃ স্বাধীনতার পরপরই লক্ষ্যণীয় মাত্রায় শুরু হয়। অবশ্য স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সীমিত পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রম বিদ্যমান ছিল। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা লাভের সামান্য কিছু পূর্বে অর্থাৎ, ১৯৭০ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের পুনর্বাসনেও সরকারের পাশাপাশি এনজিও সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুরুর দিকে এনজিওগুলো দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় জরুরী ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে তাদের কর্মকান্ড সীমিত রেখেছিল। পরবর্তীতে এসব কর্মসূচী বিভিন্ন ধরনের জনহিতকর কর্মকান্ড যেমন-দাতব্য চিকিৎসালয়, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নৈশবিদ্যালয়, পাঠাগার, শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, বিভিন্ন ধরনের মহামারী রোগ প্রতিরোধ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখতে শুরু করে। শুধু বাংলাদেশ নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে এনজিও'র অংশগ্রহণ বলা চলে দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বযুদ্ধের পরপর শুরু হয়। বস্তুতঃ তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই এনজিও কার্যক্রম শুরু হয়েছে কোন যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলশ্রুতিতে।[১] ঠিক তেমনি বাংলাদেশেও এনজিও কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রাণ ও পুর্ণবাসনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র নিরসনে সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহের সরকারের অদক্ষতা এনজিও কার্যক্রম জোরদার করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। গত প্রায় তিন দশকের সার্থক কার্যক্রম এনজিওদের এখন উন্নয়নের একটা বিকল্প মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।[২]

বাংলাদেশসহ আফ্রিকা এবং এশিয়ার দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও কার্যক্রমের রয়েছে এক দীর্ঘ ঐতিহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কেননা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এনজিও বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই অধিক কার্যকর বলে প্রমাণিত। গবেষণার সুবিধার্থে আলোচ্য অংশ প্রধানতঃ বাংলাদেশে এনজিও'র কার্যক্রমের উপর সীমিত রাখা হবে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এখন আর এনজিও'র কার্যক্রম ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আশির দশকের শুরু থেকে "পার্টিসিপেটারী ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ" নিয়ে টার্গেট-গ্রুপ হিসেবে, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র ও বিভিন্ন অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে অকৃষিখাতে কর্মসংস্থান এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি সামাজিক সেবা সমূহকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং কালক্রমে এনজিও কার্যক্রম একটি আকর্ষণীয় পেশায় রূপান্তরিত হয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থানও দিয়েছে।[৩] তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহের ন্যায় বাংলাদেশেও বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র মানুষদের বিভিন্ন সাহায্য-সহায়তা প্রদান করে তাদের নিজেদের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো; বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। কেননা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী যাদের অধিকাংশই উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকান্ডের বাহিরে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, নারী বিভিন্নভাবে উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে যা এতদিন অর্থনীতিবিদদের হিসেবে আসেনি। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে যদি উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা যায় তবে তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বর্তমান গবেষণা কার্যের মূল বিষয় হলো নারীর উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা - এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) এর কর্মসূচী ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন। সুতরাং, নারী উন্নয়ন বিষয়টির উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। নারী উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করলে প্রসঙ্গক্রমে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চলে আসে তাহলো নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর উন্নয়ন বলতে সহজ কথায় আমরা বুঝি বিভিন্ন আয় অর্জনমূলক কর্মকান্ডে নারীকে সম্পৃক্ত করে নারীকে উপার্জনক্ষম করে তোলার মাধ্যমে তার দারিদ্র বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। আর সামাজিক ইস্যু হিসেবে সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত নারী উন্নয়ন যা নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সম্ভব। এজন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও 'বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' অনুযায়ী নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করে তা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এক্ষেত্রে দারিদ্র, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নির্যাতন ও সশস্ত্র সংঘাত দূরীকরণ, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ, নীতি-নির্ধারণ এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের দিকনির্দেশনা খোঁজা হয়েছে।[৪] তাহলে এটা স্পষ্ট যে, নারী উন্নয়নের জন্য যেটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন যা একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং অবিভাজ্য ধারণা। ক্ষমতায়ন অর্থ হল যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সব বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাদপদ অবস্থায় রাখে তা থেকে উত্তরণ।[৫] ফলে প্রত্যেকের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি এবং অবদান রাখা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এর সুযোগ সৃষ্টি হবে। ক্ষমতায়ন বলতে নিম্নোক্ত চার ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বুঝায়:[৬]

Dhaka University Institutional Repository

১. বস্তুগত সম্পদ যার মধ্যে রয়েছে স্থানিক সম্পদ যেমন - জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি;

২. মানবিক সম্পদ যেমন-মানবদেহ এবং আর্থিক সম্পদ যেমন-অর্থ;

৩. বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ, যেমন-জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি; এবং

৪. আদর্শিক সম্পদ, যেমন - একটি নিদিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়।

ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এভাবে সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াও তরান্বিত হবে এবং সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সুতরাং, ক্ষমতায়ন এমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী তার নিজ অবস্থান বা আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে, বিরাজমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হবে এবং আপন শক্তিমত্তা অর্জনের জন্যে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বৈষম্য দূরীকরণ তথা নারী-পুরুষ সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে।[৭] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নারীর এই ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে তা নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। তবে গবেষকের মতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সর্বপ্রথম যেটি দরকার সেটি হলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা। একজন নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে পর্যায়ক্রমে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য দরকার নারীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী প্রবর্তন, নারীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য ও কর্মের সঠিক মজুরী নিশ্চিত করার পাশাপাশি শ্রমের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, মহাজনী ঋণের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, ব্যাংক বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানে তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ গঠন করা।[৮] অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের নারী শিক্ষা সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, খাদ্য গ্রহণের মাত্রা ইত্যাদি সব দিক দিয়ে পশ্চাদপদ। অগ্রসরমান বিশ্বের সাধারণ চিত্রায়নেও

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যমুখর একটি সমাজ ব্যবস্থাই দৃশ্যমান হয় যেখানে সম্পদ, মর্যাদা, ক্ষমতা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর সুষম অধিকারের প্রসঙ্গটি অবহেলিত হয়ে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর বস্তুগত সম্পদ প্রাপ্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হলেও তাদের অবস্থানগত অর্থাৎ মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং অধিকার অর্জনের পথ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশস্ত হয়নি।[৯] নারীর প্রতি পুরাতন ধ্যান-ধারণার কারণে নারী শিক্ষার যেমন কাংখিত প্রসার ঘটতে পারেনি তেমনি নারী উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হয়নি। ফলে নারী-পুরুষের ব্যবধান বা বৈষম্যও কমেনি। বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। আমাদের দেশে পুরুষের শিক্ষার হার যেখানে ৫৫%, সেখানে নারী শিক্ষার হার ৩৮.৭০%, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ন্যূনতম ২০০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হলেও একজন নারীর সেখানে ১২০০-১৫০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের যোগান দেয়াও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়; একই কাজে নারী-পুরুষের পারিশ্রমিকেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। মোট কথা বাংলাদেশের নারী বিশেষতঃ গ্রামীণ নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ, সম্পত্তির মালিকানা, মজুরী ও বেতন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না।[১০] আর এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন এনজিও। এসব এনজিও কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের পথ সুগমকরণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন। এক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের গৃহীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিশেষ করে নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফলতার জন্য এনজিওদের সহায়তার গুরুত্ব যে অপরিসীম তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বাংলাদেশের দারিদ্র-পীড়িত অর্থনীতিতে নারীদের কর্মসংস্থান ও তৃণমূল পর্যায়ে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে অনেক এনজিও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে যা আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

নারী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য, পুষ্টির উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, নারীর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য ও ন্যায্য মজুরী নিশ্চিতকরণ, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী প্রচলন, ব্যাংক ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানের মাধ্যমে মহাজনী ঋণের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদির দ্বারা স্বাধিকার অর্জন ও নিজ প্রয়োজনের আলোকে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার্জন। এজন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন, বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের পাশাপাশি নারীর স্ব-পক্ষে বিদ্যমান আইন সমূহের সফল বাস্তবায়ন এবং নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যক। আর এ লক্ষ্য নিয়েই এনজিওসমূহ বাংলাদেশে তাদের কর্মসূচী প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করে চলছে। আলোচ্য গবেষণায় সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি রেখে কেস স্টাডি পদ্ধতিতে আলোচনার গভীরতা ও ব্যাপকতা সুনির্দিষ্ট মাত্রায় আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম এনজিও এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) - কে চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে এই সংগঠনটি নারী উন্নয়নে যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করছে তার সাফল্য এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করে গৃহীত কর্মসূচী কিভাবে আরো কার্যকর করে দুর্বলতা সমূহ কাটিয়ে উঠা যায় সে সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে ভবিষ্যতে আরো কি কি কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে 'আশা' আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে সে ব্যাপারে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ গবেষণা পরিচালনা পদ্ধতি

নারী উন্নয়নে এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে একথাটি আজ নীতি-নির্ধারকসহ সমাজের সচেতন মহলের নিকট স্বীকৃত বিষয়। এসব এনজিও সমূহের মধ্যে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) কতটা ভূমিকা রাখছে তা মূল্যায়ন করে দেখার জন্য আলোচ্য গবেষণা কার্যক্রমটি নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভর। তবে গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক তথ্যের চেয়ে মাধ্যমিক তথ্যের উপর বেশি নির্ভরশীল। এজন্য বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক ইতোপূর্বে সম্পাদিত গবেষণা যা আলোচ্য গবেষণার সাথে সম্পর্কিত ও প্রাসঙ্গিক সে সব তথ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় -

ক) আশা'র বিগত কয়েক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত নারী বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও বুলেটিন, বিভিন্ন জাতীয় পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ফিচার ও সংবাদ ইত্যাদি; এবং

খ) বিভিন্ন গ্রন্থ, আশা'র উপর দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বিভিন্ন গবেষক ও লেখকের এনজিও ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক গ্রন্থ, গবেষণা প্রতিবেদন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক, প্রতিবেদন, তথ্য ও উপাত্ত ইত্যাদি।

এছাড়া সীমিত পর্যায়ে প্রাথমিক তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো আশা'য় কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে সরাসরি আলাপক্রমে প্রাপ্ত তথ্য ইত্যাদি। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে এবং বিদ্যমান গবেষণা কর্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সীমিত পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে তা দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মতৎপরতার সাথে সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এসব বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রাম উন্নয়ন, সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে এক বিশেষ ভূমিকা রাখছে যার ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এসব কার্যক্রমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের আলোচনা বা বিতর্ক থাকলেও তা যে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বা সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনছে বা পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে সে বিষয়টি আজ অনেকটা স্পষ্ট। বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের গতিশীলতা বা মবিলিটি ও যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে তারা অধিকার সচেতন হচ্ছে, এক ধরনের নেতৃত্ব গড়ে উঠছে, আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনুকূল পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ফলে দেশের জনসাধারণের মূল্যবোধ, রীতিনীতিতে পরিবর্তনসহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিভিন্ন এনজিও'র এসব উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সডমেন্ট (আশা) কর্তৃক কী কী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং এসব কর্মসূচী নারী উন্নয়নে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছে তা মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করাই আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। আলোচ্য গবেষণা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলে তা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়ঃ

(ক) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আশা'র উৎপত্তি এবং সংগঠনটি দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে অসহায়, বিত্তহীন নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কী ধরনের ভূমিকা রাখছে তা পর্যালোচনা করা;

(খ) নারী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে 'আশা' কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন ও উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখছে তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা;

(গ) নারীর কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণে আশা'র অবদান পরীক্ষা করে দেখা; এবং

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) 'আশা' কর্তৃক নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক উন্নয়ন কর্মসূচীর দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা কিভাবে দূর করার মাধ্যমে নারী তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে সে ব্যাপারে সুপারিশ করা।

মূলতঃ উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গবেষণা কর্মটি পরিচালনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

নারী উন্নয়নে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সডমেন্ট (আশা) এর কর্মসূচী ও কার্যকারিতার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে যে সব সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। প্রথমতঃ নির্ধারিত বিষয়ের উপর ইতোপূর্বে সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমের অভাব। নারীর উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যেমন- নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মসংস্থানে এনজিও প্রবর্তিত ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা, নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা সচেতনতা সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও নারী উন্নয়নে একটি নির্দিষ্ট এনজিও বিশেষ করে আশা'র ভূমিকা সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি বললেই চলে। ফলে আলোচ্য গবেষণার জন্য মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা কর্মটির পরিসর বিভিন্ন কারণে একটি এনজিও সংগঠনের কার্যক্রমকে নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ গবেষণাটি মূলতঃ মাধ্যমিক তথ্য নির্ভর। বর্তমান গবেষণার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে তেমন কোন প্রাথমিক তথ্যই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো আলোচ্য গবেষণা কর্মটি পরিচালনার জন্য কোনরূপ আর্থিক অনুদান, বৃত্তি বা সহায়তা পাওয়া যায়নি। আশা'র কয়েকজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট সরাসরি আলাপের মাধ্যমে কিছু মতামত, পরামর্শ ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন প্রশ্নমালার মাধ্যমে 'আশা'র কর্মকান্ড থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের কাছ থেকে তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহ করা গেলে হয়তো আশা'র কর্মসূচী ও কার্যকারীতা সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ও বাস্তবমুখী ধারণা পাওয়া সম্ভব হতো এবং ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে আরো সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণযন করা সম্ভব হতো। সংগঠনটির সাংগঠনিক বিষয় উন্মুক্ত না থাকায় এরূপ তথ্য সংগ্রহে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে পরিচালিত প্রায় সকল গবেষণার ন্যায় আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রেও যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য সরবরাহে অনীহা। এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের কাছে যে সব তথ্য আছে তা সরবরাহ না করে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবনতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখানেই গবেষণা কর্মটির বিশেষ দুর্বলতা।

উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান গবেষণা কর্মটি সংশ্লিষ্ট এনজিওসহ অন্যান্য এনজিও, নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ও সরকারী-বেসরকারী নীতি-নির্ধারকদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে এবং এতদসংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

১.৫ গবেষণা পর্যালোচনা

নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, নীতিমালা ঘোষণা, কর্মপন্থা নির্ধারণসহ বেশ কিছু গবেষণা কার্যক্রমও সম্পাদিত হয়েছে। নিম্নে এনজিও এবং নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম পর্যালোচনা করা হলোঃ

অদিতি নাগ চৌধুরী[১১] তাঁর পোষ্ট ডক্টরাল গবেষণায় উপর ভিত্তি করে *"Let Grassroots Speak: Peoples Participation, Self-help Groups and NGO`s in Bangladesh"* গ্রন্থে আত্ম-কর্মসংস্থান, আয় বর্ধক, ফাংশনাল শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে ভূমিহীন এবং নারীর মত সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নিরাপত্তা, নতুন সচেতনতা সৃষ্টি এবং কৌশল প্রণয়নের জন্য বিকল্প উপায়

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে কিভাবে বাংলাদেশে এনজিও'র আবির্ভাব ঘটেছে তা উল্লেখ করেছেন। গবেষক বাংলাদেশের গ্রামীণ চিত্রের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিও'র বহুমুখী ভূমিকা ব্যাখা করেছেন। তাঁর গবেষণা কর্মটি মূলত: চারটি পর্যায়ভুক্ত যার প্রথম অংশে গ্রামীণ উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের মৌলিক বিষয়াবলী, উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের প্রথাগত পদ্ধতি ও সীমিত সফলতা এবং নতুন এ্যাপ্রোচের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের কারণ ও তা সমাধানের লক্ষ্যে কুমিল্লা মডেল ও তার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে গবেষকের মতে যে সব এনজিও উন্নয়নের বিকল্প ধারা বা পন্থা অনুসরণ করছে এমন নির্বাচিত চারটি কেস স্টাডি। এই চারটি কেস স্টাডি পরিচালিত হয় 'ব্র্যাক', 'প্রশিকা', 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' এবং 'নিজেরা করি' এর উপর। গবেষকের গবেষণার এটাই হচ্ছে মূল বিষয়বস্তু যার মাধ্যমে তিনি অংশগ্রহণমূলক তৃণমূল কর্মকান্ডের জটিলতা এবং উদ্বেগ তুলে ধরেছেন এবং স্থানীয় কাঠামোতে তা কীভাবে সর্বোত্তমভাবে সমাধান করা যায় তা নির্দেশ করেছেন। চতুর্থ বা সর্বশেষ অংশে রয়েছে গবেষণা থেকে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কী ধরনের উদ্ভাবনী কৌশল প্রণয়ন করা যায় তার সুপারিশ।

সালমা খান[১২] তাঁর " *The Fifty Percent - Women in Development and Policy in Bangladesh"* নামক গবেষণাধর্মী গ্রন্থে দারিদ্র এবং ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক বিভিন্নতা, জটিলতা এবং ব্যপ্তিশীলতা কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে এবং তা কীভাবে নারীর জীবন প্রণালী প্রভাবিত করছে তা বর্ণনা করেছেন। গবেষক বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতির বিশেষ প্রকৃতির কারণে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ অদৃশ্যমানতার কারণ, তাদের অবদান কেন যথাযথ স্বীকৃতি পাচ্ছে না এবং জরুরী প্রয়োজন ও ইস্যুসমূহ কীভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে তা উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁর গবেষণায় বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং নীতি-নির্ধারণী কর্মকান্ডে নারীর অবস্থান অপ্রত্যাশিত এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে নারী স্থায়ীভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে তা ফুটে উঠেছে। সেইসাথে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস এবং প্রতিকূল

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে নারীর অবদান ব্যাপক এবং এজন্য নির্দিষ্ট জেন্ডারভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়নে নারীর জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কাজে তাদের অংশগ্রহণ অর্থনীতিতে ব্যাপক উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে। গবেষক তাঁর গবেষণা কর্মটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করেছেন যার প্রথম ভাগে তিনি বাংলাদেশে নারীর অবস্থানের সামষ্টিক চিত্র যেমন - শিক্ষা, কর্মশক্তিতে নারীর অবস্থান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, আইনগত অবস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রাজনীতি এবং প্রশাসনে নারীর প্রতিকূল অবস্থান তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অংশে নারীর কর্মসংস্থান যেমন-কৃষি, অকৃষি, সংগঠিত সেক্টর, মজুরী, সরকারী চাকুরী ও তাতে কোটা সংরক্ষণ, নিয়োজিত নারীর সংখ্যা, নারীর কর্মসংস্থানে কোটার প্রভাবসহ শিল্প, সামরিক-আধাসামরিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান, মজুরীর হারে ভিন্নতা, নারী ও প্রযুক্তি, শিশু যত্ন সুবিধা, পরিবহন-বাসস্থান সমস্যা, পারিবারিক কাজের চাপ ইত্যাদি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তৃতীয় অংশে উন্নয়নমূলক পলিসি এবং কর্মসূচীতে নারীর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে গবেষক নারীর উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচী এবং নারী উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করেছেন। চতুর্থ পর্যায়ে গবেষক নারী শ্রম-শক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে নারীর দারিদ্রতা এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন, নারী উন্নয়নে বিনিয়োগের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণা থেকে আরো জানা যায় যে, নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নারীর আচরণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, নারী নিয়োগে ব্যয় কম এবং নারীর ব্যয়ের ধরন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রিক। সবশেষে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রভাব অবহেলিত নারীর আর্থ-সামাজিক জীবনে কী প্রভাব ফেলে তা মনিটরের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কেননা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি যে নারীর জীবনমান উন্নত করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বরং তা অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের আশ্রয়হীন ও প্রথাগত পেশা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে যদি না নারীর জন্য বিকল্প ও পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মপন্থা নির্ধারণে ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্টুয়ার্ট রাদারফোর্ড[১৩] আশা'র উপর পরিচালিত *"ASA : The Biography of an NGO"* গবেষণায় মূলতঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কীভাবে আশা'র উন্মেষ ও উত্তরণ ঘটেছে সে দিকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করার প্রচেষ্টা চালানোর পাশাপাশি এ অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের ঋণদান কার্যক্রম, তার সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর গবেষণাধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গবেষক বাংলাদেশের গ্রামীণ আন্দোলনের পটভূমি, কোন্ প্রেক্ষাপটে 'আশা' ঋণ কার্যক্রম শুরু করেছিল এবং একটি আন্দোলনমুখী সংস্থা থেকে 'আশা' কীভাবে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে একটি গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছেন। মূলতঃ এটি আশা'র আত্ম-জীবনীমূলক একটি গবেষণা কর্ম যার মাধ্যমে গবেষক আশা'র ঐতিহাসিক শেকড়, এর উত্থান ও বিকাশ, এর কর্মী, কাজ এবং তার ভবিষ্যত সম্পর্কে পাঠককে ধারণা প্রদানসহ বাংলাদেশে এনজিও বিকাশের ধারা মূল্যায়ণ এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানের আগ্রহের বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন।[১৪]

মুহাম্মদ ইউনুস[১৫] তাঁর *"পথের বাঁধা সরিয়ে নিন মানুষকে এগুতে দিন"* গ্রন্থে দারিদ্রকে সকল রোগের মূল উৎস বলে চিহ্নিত করে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উপার্জন নিশ্চিতকরণের জন্য বলেছেন এবং শেষোক্তটি অর্থ্যাৎ উপার্জন নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দারিদ্র বিমোচনের জন্য যে তিনটি ক্ষেত্রে সরকারকে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে সুপারিশ করেছেন তা হলোঃ (১) কর্মসংস্থান, (২) গরীবদের জনস্বাস্থ্য এবং (৩) গরীবদের জন্য শিক্ষা। গবেষক এও বলেছেন যে, কর্মসংস্থান হতে পারে আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান। তবে মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান হলেই যে দারিদ্র বিমোচন হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কেননা মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানে যদি নিয়োজিত ব্যক্তির মজুরী পর্যাপ্ত না হয় তবে তা তাকে আরো স্থায়ীরূপে দারিদ্র করে রাখবে। সেই সাথে মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন বড় অংকের বিনিয়োগ। অন্যদিকে আত্ম-কর্মসংস্থান বা স্ব-কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ কর্মসূচী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মজুরীভিত্তিক

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে গেলে মাথাপিছু যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় তার এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বিনিয়োগের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যেতে পারে। তবে গবেষক এর জন্য যে বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো সু-শৃংখলা সম্পন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কারণ স্বাধীনতার পর দারিদ্র বিমোচনের জন্য এ পর্যন্ত বাইশ বিলিয়ন ডলারেরও অধিক সাহায্য পেয়েও বাংলাদেশ কতটা দারিদ্র বিমোচনে সক্ষম হয়ে সেটা আজ যে কোন সচেতন মহলের কাছেই স্পষ্ট। কারণ বিভিন্ন শর্তযুক্ত বৈদেশিক সাহায্য এমন সব প্রকল্পে ব্যয় করা হয়েছে যার প্রায় ৭৫% ব্যয় হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় ও বৈদেশিক কনসালট্যান্টদের বেতন ভাতা খাতে। কোন একটি প্রকল্প গ্রহণ করার আগে দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তি, মহিলাদের উন্নয়ন, পরিবেশের উপর প্রভাব, রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা ছাড়াও স্ব-নির্ভরতা অর্জনে প্রকল্পটির ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকা কী হতে পারে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা উচিত। তাছাড়া দারিদ্র বিমোচন করতে হলে লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। গবেষক এও উল্লেখ করেছেন যে, সমাজের নীচের অর্ধেক মানুষের জীবন থেকে দারিদ্র বিমোচনের নীতি গ্রহণের সংগে সংগে আবার একটি অগ্রাধিকার স্থির করে নিতে হবে। যেমন- সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ মানুষ সবচাইতে অগ্রাধিকার পাবেন। তবে সমাজের নীচের অর্ধেক জনসংখ্যার মধ্যে যেহেতু নারীর সংখ্যাই বেশি সে কারণে দরিদ্র মহিলাদের প্রতি অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে গবেষক অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন এটা যেমন উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন তেমনি তাঁদের দুর্বলতার কারণেও প্রয়োজন। কেননা দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ স্বামী নিগৃহীতা, পরিত্যাক্তা, তালাকপ্রাপ্তদের নিয়ে গঠিত। ফলে দারিদ্র যাদের কাছে সবচাইতে রূঢ়তম রূপ নিয়ে দেখা দেয় তারা হলেন দরিদ্র মহিলা। এজন্য তাঁদেরকে যেভাবে সারা জীবন ধরে অভাবের মোকাবেলা করতে হয়, দারিদ্র যেভাবে তাঁদেরকে অবমাননা করে, নিষ্পেষিত করে পুরুষকে সেভাবে করে না। গবেষক এও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অভাব দূর করার সামান্যতম সুযোগ পাওয়া গেলে দরিদ্র নারীরা সেটাকে যেভাবে আঁকড়ে ধরেন, পুরুষ সেভাবে করেন না। ফলে নারীর মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্রচেষ্টা সফল হয় বেশি। তাঁর মতে রূঢ় বাস্তবতার কারণেই নারীরা নিজের নিরাপত্তা, স্বামীর

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা, সন্তানের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যত স্বচ্ছলতার জন্য বর্তমান আয় থেকে পুরুষের চেয়ে অধিক সঞ্চয়ী হয়ে থাকে। এজন্য নারীরা ঋণের আওতায় আসলে তারা তা সফলভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে গবেষক তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের সফলতারও কিছু ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন ঋণকে তিনি একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকায় দেখেছেন এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত ঋণকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন দরিদ্রদের জন্য।

মোহাম্মদ ইউনুস[১৬] কর্তৃক সম্পাদিত *"Jorimon of Beltoil Village and Others: In Search of a Future"*- এ ষোল জন গ্রামীণ দরিদ্র নারীর জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছেন। এসব নারী কিভাবে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং সে প্রচেষ্টায় ঋণ কর্মসূচী কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত দিক তুলে ধরার প্রয়াস গবেষক চালিয়েছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় যে সব ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণ করেছে তারা আদৌ লাভবান হয়েছে কি-না, গৃহীত ঋণ ব্যবহার ও তা পরিশোধে কোন ধরনের সমস্যা/বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে কি-না তা পর্যালোচনা করে দেখার জন্য কেস-স্টাডি হিসেবে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ গবেষণায় দরিদ্র লোকেরা অশিক্ষিত, অদক্ষ, নিজের ভাগ্য উন্নয়নে অনাগ্রহী, সমাজের নিজদের অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং পর্যায়ক্রমে নিজের ভাগ্য উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রতি নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি চিরাচরিত ও ভ্রান্ত ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে, মূলধনী সহায়তা সেটা ক্ষুদ্র, মাঝারি কিংবা বৃহৎ যে আকারেরই হোক না কেন তা তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়তা করে। কিন্তু সমাজে যখনই দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করা এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তখনই দেখা যায় এরূপ চিন্তা বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে পুরুষকে কেন্দ্র করে এবং নারীকে ভাবা হয় সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে। কিন্তু নারীও যে, সামান্য মূলধনের সংস্থান হলে তা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ করে নিজে লাভবান হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে এবং সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম তা আলোচ্য গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া নারী কর্তৃক আয় অর্জন ও আয় বৃদ্ধির ফলে যে, দু'টো ইতিবাচক প্রভাব সমাজে পড়ে বলে এ গবেষণার ফলাফলে বের হয়ে এসেছে তা হলো - (ক) নারীর আয় বৃদ্ধির প্রাথমিক সুবিধা ভোগ করে তার শিশু- যেমন নতুন বস্ত্র পরিধান, লেখা-পড়ার জন্য স্কুলে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে; এবং (খ) বাসস্থানের উন্নয়ন/মেরামত যার সুবিধা ভোগ করে পরিবারের সকল সদস্য। এভাবে গবেষক আলোচ্য গবেষণাধর্মী গ্রন্থে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কিভাবে করা যায় তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

রুহুল আমিন[১৭] তাঁর *"Development Strategies and Socio-Demographic Impact of Non-Governmental Organizations: Evidence From Rural Bangladesh."* গ্রন্থে বাংলাদেশের নির্বাচিত কিছু গ্রামীণ এলাকায় তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাভোগী দল এনজিও পরিচালিত বিকল্প উন্নয়ন কর্মসূচী ও কৌশলের মাধ্যমে কিভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট থেকে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন তা তুলে ধরেছেন। গবেষক গুণাত্মক ও সংখ্যাত্মক (Qualitative and quantitative) উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রনের মাধ্যমে এনজিওভিত্তিক তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কৌশল হিসেবে ঋণ কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক এবং তার সামাজিক ও ডেমোগ্রাফিক প্রভাব আলোচনা করেছেন। এজন্য বাংলাদেশের নির্বাচিত কিছু এলাকায় এনজিও কর্তৃক তৃণমূল পর্যায়ে সমন্বিত কর্মসূচী যা অধিকাংশ এনজিও কর্তৃক অনুসৃত হয় তার কৌশল ও সামাজিক-ডেমোগ্রাফিক প্রভাব সম্পর্কে সুন্দরভাবে এ গবেষণাধর্মী গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। গবেষক এজন্য বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় জনসংখ্যাগত প্রধান সমস্যা এবং উন্নয়ন সমস্যা সমাধানে দারিদ্র বিমোচন, আয় অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সুবিধাভোগী গ্রুপ সমূহ ঘনিষ্টভাবে কাজ করে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার যে বিশাল সম্ভাবনা এনজিও'র রয়েছে সে দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এজন্য

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক বড়, মাঝারি, ছোট প্রভৃতি আকারের আয়-অর্জনকারী প্রকল্প, তার ভিত্তি, এপ্রোচ, উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট কর্মীর জবাবদিহিতা, প্রকল্পে অংশগ্রহণ, তার চলমানতা ইত্যাদিসহ সরকার ও এনজিও'র যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদির বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। সেজন্য এনজিওভিত্তিক ঋণ কর্মসূচী, ঋণ গ্রহীতার পেশাগত বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারের ধরন, ঋণগ্রহীতার সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী এলাকায় এনজিওভিত্তিক ঋণ কর্মসূচী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে এনজিওভিত্তিক ঋণের প্রভাব, টীকা কর্মসূচী ও শিশুমৃত্যু হারে তার প্রভাব, ঋণ আদায়ের হার ইত্যাদিসহ ঋণগ্রহীতার আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে ঋণের প্রভাব, ঋণ কর্মসূচীর সহনশীলতা (Sustainability) এবং এনজিও কর্মসূচীর ভবিষ্যত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করে এর গুণবাচক ও সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

জিয়াউন নাহার খান এবং রাশিদা খানম[১৮] তাঁদের *"Proverty, Women and Rural Development in Bangladesh"* - গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়ন গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। গবেষকদ্বয় এ সংক্রান্ত আলোচনা মোট সাতটি অংশে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছেন যার প্রথম অংশে তাঁরা কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বরূপ, দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা যারা ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন, বিশ্বের প্রেক্ষাপটে দারিদ্রতায় বাংলাদেশের অবস্থান ইত্যাদি তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, আয়-অর্জনকারী প্রকল্পে যদি নারীদের সঠিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হয় তবে গ্রামীণ উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। পাশাপাশি উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণে গ্রামের প্রভাবশালীদের দ্বারা সৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা, জোতদারী, মহাজনী প্রথা কীভাবে নারী উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে নারীর ভূমিকা যেমন- গ্রামীণ উন্নয়ন ও তার গুরুত্ব এবং দারিদ্র বিমোচনে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা এবং মর্যাদা সুন্দরভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। যেমন- আয়

Dhaka University Institutional Repository

বর্ধকমূলক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ, কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নিয়োগ ক্ষেত্রে নারী নিয়োগের ধারা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। গ্রামীণ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ যে সব বাধা যেমন- সামাজিক মনোভাব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান, বাল্যবিবাহ, শিক্ষার অভাব, জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য ইত্যাদি তুলে ধরেছেন চতুর্থ অধ্যায়। পঞ্চম অধ্যায় আলোকপাত করেছেন বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা যেমন- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী, নারী সমবায়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রুর‍্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক), গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি কর্তৃক নারী উন্নয়নমূলক কিছু কিছু কর্মসূচী বর্ণনা করেছেন। আর ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষকদ্বয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিষয়। যেমন- নারীর কর্মনিয়োগ এবং কৌশলগত শিক্ষার প্রয়োজন, উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন, প্রযুক্তির প্রতিকূল প্রভাব, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়। সবশেষে গবেষকদ্বয় এই বলে উপসংহার টেনেছেন যে, বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। কেননা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী যাদের উন্নয়ন বা তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে দূরে রেখে জাতীয় অর্থনীতি তথা দেশের সঠিক উন্নয়ন কাংঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না।

Martha Alter Chen[১৯] তাঁর *"A Quiet Revolution: Women in Transition in Rural Bangladesh"* গ্রন্থে নারী, দারিদ্র এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার প্রভাব ইত্যাদি কেস স্টাডি আকারে তুলে ধরেছেন। গবেষক ব্র্যাক ও তার ঋণদান কর্মসূচী সম্পর্কে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র নারী কিভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করে প্রদত্ত ঋণ কর্মসূচীর আওতায় এসে উচ্চ আয় অর্জন, অধিক ক্ষমতা অর্জন এবং আত্ম-অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করতে পেরেছে তার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এসব কর্মসূচীর উন্নয়ন ও তার প্রয়োগ থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন পলিসি নির্ধারণে নির্দেশিকা হিসেব কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কে আলোকপাত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। গবেষক তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় দারিদ্র এবং নারী এই জটিল ও বাস্তব সত্যটি সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ভূমিকা এবং এতে প্রযুক্তিগত, কাঠামোগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাঁধা, নারী হিসেবে নারীর সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তেমনি দারিদ্র এবং নারীর পরিবর্তনশীল ভূমিকা, শ্রেণীভিত্তিক নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা, নারীর কাজে বাঁধা এবং দরিদ্র পরিবারের সদস্য হিসেবে নারীর সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণাধর্মী ফলাফল তুলে ধরার পাশাপাশি এসব সমস্যা সমাধানের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে কি করণীয়, অতীতে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ইত্যাদির যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক বর্তমানে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে তার ফলাফল আলোচনা ও পর্যালোচনা পূর্বক তা থেকে শিক্ষণীয় কি এবং তার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য আরো ফলপ্রসূভাবে কি ধরনের কর্মসূচী ও কৌশল প্রণয়ন করা যায় যার মাধ্যমে নারীর প্রকৃত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিক ভূমিকা রাখা যায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত রাখার চেষ্টা করেছেন।

উপরিউক্ত গবেষণা পর্যালোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এসব গবেষণা কার্যক্রমের কোনটিই সরাসরি নারী উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা বা নারী উন্নয়নে আশা'র কর্মসূচী ও কার্যকারীতা মূল্যায়ন সংক্রান্ত নয়। যেমন- প্রথমোক্ত গবেষণায় গবেষক (অদিতি নাগ) গ্রামীণ দারিদ্র, তার কারণ, গ্রামীণ উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রথাগত পদ্ধতি, তার সফলতার নিম্নহার, নতুন এপ্রোচের প্রয়োজনীয়তা, কুমিল্লা মডেল ও তার পরবর্তী এ্যাপ্রোচ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর গবেষণার সমর্থনে চারটি এনজিওকে কেস স্টাডি হিসেবে বেছে নিয়ে তার উপর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তৃণমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশলের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জটিলতা ও উদ্বেগের উপর মন্তব্য শেষে বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনের জন্য স্থানীয় কাঠামোতে তা কীভাবে খাপ খাওয়ানো যায় বা আরো উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ করার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌছা যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। অন্যদিকে **সালমা খান** এর গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গবেষক মূলতঃ

Dhaka University Institutional Repository

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান কী তার চিত্র তুলে ধরেছেন। অর্থ্যাৎ, বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও নীতি-নির্ধারিণী কর্মকান্ডে নারীর অবস্থান কোন পর্যায়ে রয়েছে তা উল্লেখ করতে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাদপদতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এরূপ পশ্চাদপদতা দূরীকরণে নারীকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নারী উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। সেইসাথে সীমিত পর্যায়ে নারী উন্নয়নে নিয়োজিত কিছু এনজিও'র ভূমিকার প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করেছেন এবং কিছু নির্বাচিত এনজিও এজন্য কি কি কর্মসূচী নিচ্ছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। এসব এনজিও'র কর্মকান্ড নারী উন্নয়নে কতটা সহায়ক ভূমিকা রাখছে তার বিস্তারিত দিক বর্ণনা না করে বরং তাদের কর্মসূচীর কিছু প্রধান প্রধান দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে নারী উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা ও তার কর্মসূচীর কার্যকারীতা সম্পর্কে সম্যক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

আবার **রাদারফোর্ড** এর গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গবেষণা কর্মটি মূলতঃ পরিচালিত হয় কিভাবে আশা'র উৎপত্তি ও সম্প্রসারণ ঘটেছে তা নিয়ে। এটির ঋণদান কর্মসূচীর প্রেক্ষাপট, ঋণের সফলতা-ব্যর্থতা, পর্যায়ক্রমিক বিকাশের মধ্য দিয়ে এটি কীভাবে একটি আন্দোলনমুখী সংস্থা থেকে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এর ভবিষ্যত কর্মকান্ড কোন্ দিকে পরিচালিত হতে পারে সে সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যতদ্বাণী করার চেষ্টা করেছেন। দারিদ্র বিমোচনে আশা'র কর্মকান্ডের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলেও নারী উন্নয়নে আশা'র ভূমিকা কি বা ভবিষ্যতে হতে পারে সে ব্যাপারে গবেষক স্পষ্ট করে তেমন কিছু উল্লেখ করেন নি।

মুহাম্মদ ইউনুস তাঁর প্রথম গ্রন্থে অত্যন্ত চমৎকারভাবে দারিদ্রের স্বরূপ, তা দূরীকরণে বিভিন্ন উপায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠলেও এটি মূলত: সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর গবেষণায় সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত দরিদ্র নারীর উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত থাকলেও বিস্তারিত তেমন কিছু উল্লেখ নেই। আর সমাজের দারিদ্র বিমোচন হলেই যে, নারীর উন্নয়ন হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে করণীয়

Dhaka University Institutional Repository

কী, সেক্ষেত্রে সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও'রা কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বা বর্তমানে রাখছে তার বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা নেই। তবে একথা ঠিক যে, সমাজের নীচের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের যে ইঙ্গিত তিনি করেছেন তার ভিতরে নারীর সংখ্যাই অধিক এবং তাদের উন্নয়ন বলতে তিনি পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের কথাই বলেছেন। গবেষক তাঁর সম্পাদিত দ্বিতীয় গ্রন্থে ঋণ সুবিধা কিভাবে একজন সংগ্রামী দরিদ্রের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গবেষকের এরূপ প্রচেষ্টাও মূলতঃ সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে আলোচ্য গ্রন্থে কেস স্টাডি হিসেবে ঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত বিভিন্ন নারীকেই বেছে নিয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন এরূপ ঋণ কিভাবে তার জীবনধারা পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে তা তুলে ধরতে। কিন্তু এরূপ ঋণ সুবিধা শুধু নারীর জন্য প্রবর্তিত নয় বা সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত নারীকে ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় কি এবং তাদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি আলোচ্য গবেষণা কর্মে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। ফলে বলা যায় গবেষকের এরূপ উদ্যোগ বা প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণ নারী কেন্দ্রিক নয়; বরং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত ঋণ কর্মসূচীর প্রভাব নিয়ে।

রুহুল আমিন কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাটি মূলতঃ দারিদ্র নিরসনের মাধ্যমে পল্লী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা বিশেষ করে এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ কিভাবে এবং কতটা তৃণমূল পর্যায়ে অবদান রাখতে পারে সে সম্পর্কিত। এ সম্পর্কে গবেষক তাঁর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গের প্রতি কিছুটা আলোকপাত করেছেন। আর তৃণমূল পর্যায়ে যেহেতু নারীর অবস্থান আরো বেশি পশ্চাদপদ সে কারণে অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নে নারী ও এনজিওর ভূমিকা প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে এসেছে । তবে সুনির্দিষ্টভাবে নারী উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা কি বা নারী উন্নয়নে নির্দিষ্ট কোন এনজিও কর্তৃক কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে এবং তার প্রভাব কতটুকু তা আলোচ্য গবেষণায় স্থান পায়নি। গবেষক তার গবেষণা কর্ম মূলতঃ দারিদ্র ও তা নিরসনের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং সেক্ষেত্রে এনজিওর ভূমিকা সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্যে অর্জনে অনেকটাই সক্ষম হয়েছেন এটা বলা যায়। এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা কিছুটা গুরুত্ব পেলেও জনসংখ্যার অর্ধেক নারী বিশেষ করে গ্রামীণ নারী যাদের অবস্থার যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন ও তা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন তরান্বিত করার উদ্যোগ আবশ্যক যা আলোচ্য গবেষণা কর্মে যথার্থভাবে ও পর্যাপ্তভাবে স্থান লাভ করেনি ।

জিয়াউন নাহার খান ও রাশিদা খানম কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা গ্রন্থটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গবেষকদ্বয় গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামীণ দারিদ্রের বিভিন্ন দিক এবং এর উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, ভূমিকা, অবস্থান, কর্মসংস্থানের সুযোগ, গ্রামীণ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি দিক সম্পর্কে সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ নয়। যেমন- উল্লিখিত ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের গবেষণা যতটা গভীরে পরিচালনার চেষ্টা করেছেন, সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে ততটা সুস্পষ্ট সুপারিশ পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া, নারী উন্নয়নে কিছু সরকারী সংস্থা যেমন- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডসহ দুইটি বেসরকারী সংস্থা যেমন- ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের কিছু কিছু কর্মসূচীর প্রতি আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এসব সংগঠনের নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচী ও তার প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনার গভীরে যাননি।

Chen তাঁর গবেষণায় নারী উন্নয়নে ব্র্যাক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী বিশেষভাবে ঋণদান কর্মসূচীর প্রভাব বা ফলাফল অর্থাৎ, দারিদ্র নিরসনে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। গবেষকের এরূপ গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যত কর্মসূচী প্রণয়নে নির্দেশিকা হিসেবে কাজে আসবে এ প্রত্যাশা করা যায়। যেহেতু ব্র্যাক বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও'র মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এবং পুরাতন একটি এনজিও, সে কারণে ব্র্যাকের উপর এরূপ কিছু কিছু গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অন্যদিকে আলোচ্য গবেষণার জন্য নির্বাচিত আশা'র উপর এরূপ গবেষণার স্বল্পতাই বর্তমান গবেষককে এ ধরনের গবেষণা কার্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর সেজন্য চেষ্টা করা হয়েছে 'আশা' কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর

Dhaka University Institutional Repository

ফলপ্রসূতা ও তার কার্যকারিতা মূল্যায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল যদি ভবিষ্যত গবেষক, নীতি-নির্ধারক, এনজিও বিশেষজ্ঞ বা এনজিওতে কর্মরতদের কোনরূপ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়ে তবে বর্তমান গবেষকের চেষ্টা কিছুটা হলেও সফল ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করা হবে।

উপরিউক্ত গবেষণা পর্যালোচনা থেকে পরিশেষে এটাই বলা যায় যে, বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় গ্রামীণ সমাজ ও নারী, গ্রামীণ অর্থনীতি ও নারী, গ্রামীণ দারিদ্র ও নারী ইত্যাদি সংক্রান্ত পর্যাপ্ত গবেষণা পরিচালিত হলেও এবং উন্নয়নে নারী এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অনেক গবেষক তাঁদের গবেষণায় স্থান দিলেও নারী উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও'র ভূমিকা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কর্মের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে নারী উন্নয়নে কোন একটি এনজিও'র উপর পরিচালিত গবেষণা কর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে কর্মরত এনজিও'দের মধ্যে 'আশা' একটি অন্যতম বৃহত্তম এনজিও এবং এর কর্মকান্ডের সিংহভাগই মূলতঃ নারী কেন্দ্রিক। ফলে নারী উন্নয়নে এনজিও'র কর্মসূচী ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে 'আশা' কে বেছে নেয়া হয়েছে। গবেষকের মতে, নারী উন্নয়নে 'আশা'র কর্মসূচী ও কার্যকারীতা মূল্যায়ন করে নারী উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিও'র কর্মকান্ড ও কার্যকারীতা সম্পর্কে কিছু সুপারিশও প্রণয়ন করা যাবে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি নির্বাচিত করা হয় এবং এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্বাচিত গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। TH. Fox, NGOs from the United States, World Development (Supplement), 1987. আরো দেখুন আহমদ মোশতাকুর রাজা চৌধুরী, সালেহ উদ্দীন আহমদ এবং মুহম্মদ গোলাম সাত্তার, "উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা: ই.পি.আই. কার্যক্রম প্রসঙ্গ", *উন্নয়ন বিতর্ক*, ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুন, ১৯৯১, পৃ ৪৫।

২। চৌধুরী, আহমদ ও সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫-৪৬।

৩। মুহাম্মদ সামাদ, *বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে এনজিওর ভূমিকা*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ ৫৮।

৪। আবেদা সুলতানা, 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশ্লেষণ', *ক্ষমতায়ন*, ১৯৯৮, সংখ্যা ২, পৃ ৪৭।

৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫০।

৬ শাহীন রহমান, 'জেন্ডার পরিভাষা/ শব্দকোষ', *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, স্টেপ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ৭ম সংখ্যা, জানু-মার্চ, ১৯৯৭, পৃ ৯০-৯১। আরো দেখুন আবেদা সুলতানা, *ক্ষমতায়ন*, ১৯৯৮, সংখ্যা ২, পৃ ৫১।

৭। নাজমা চৌধুরী ও হামিদা আখতার বেগম, ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন: গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, ঢাকা-১৯৯৫, এর মুখবন্ধ থেকে গৃহীত।

৮। ড. কাজী ফারুক আহম্মদ, এনজিও এবং একুশ শতকের উন্নয়ন চিন্তা, আব্দুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত *একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ, সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ ২১৬।

৯। বেগম রোকসানা মিলি ও মোঃ লুৎফর রহমান, গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর প্রকল্পের কার্যকারিতা, লোক প্রশাসন সাময়িকী, ষোড়শ সংখ্যা, পৃ ২৭।

১০। পূর্বোক্ত, পৃ ২৭।

১১। Aditee Nag Chowdhury, *Let Grassroots Speak: Peoples participation, Self-help Groups and NGO's in Bangladesh*, University press Ltd, Dhaka, Bangladesh, 1989.

Dhaka University Institutional Repository

১২। Salma Khan, *The Fifty Percent - Women in Development and Policy in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 1993.

১৩। Stuart Rutherford, *ASA: The Biography of an NGO,* ASA, Dhaka, Bangladesh, 1995.

১৪। স্টুয়ার্ট রাদারফোর্ড, *আশা: একটি এনজিও'র আত্ম-কাহিনী,* শিরীন রহমান সম্পাদিত, আশা, ঢাকা, ২০০১।

১৫। মুহাম্মদ ইউনুস, *পথের বাধা সরিয়ে নিন মানুষকে এগুতে দিন,* ঢাকা, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

১৬. Muhammad Yunus ed. *Jorimon of Beltoil Village and Others: In Search of of a Future,* Grameen Bank, Dhaka, 1982.

১৭. Ruhul Amin, *Development Strategies and Socio-Demographic Impact of Non-Governmental Organizations: Evidence from Bangladesh,* University Press Limited, Dhaka, 1997

১৮। F.R.M Ziaun Nahar Khan and Rashida Khanam, *Poverty, Women, and Rural Development in Bangladesh,* Computer Home, Chittagong, Bangladesh, 1998.

১৯. Martha Alter Chen, *A Quiet Revolution: Women in Transition in Rural Bangladesh,* Schenkman Publishing Company, Inc., Cambridge,1983.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়, উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব উন্নয়ন কৌশল সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা ও তার ক্রমবিকাশ, উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী কতটুকু অংশগ্রহণ করছে বা করতে পারছে তার চিত্র এবং নারী উন্নয়ন বা উন্নয়নে নারী কেন গুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয় নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

২.১ উন্নয়ন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণা

উন্নয়ন একটি গতিশীল ও পরিবর্তনীয় ধারণা। উনবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়ন বলতে বুঝাতো যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে গঠিত একটি আধুনিক রাষ্ট্র; শ্রমবিভক্তির সম্প্রসারণ; ব্যবসা, শিল্প ও লোক প্রশাসনে নতুন ধরনের সংগঠন; জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; উন্মুক্ত শিল্পোদ্যোগ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ; এবং সাংবিধানিক ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার পদ্ধতির আওতায় রাজনৈতিক গণতন্ত্র।[১] শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্নয়ন বিষয়টি একটি গতিশীল ধারা। ফলে আজকে যেটিকে উন্নয়ন বলা হয় আগামীতে সেটি উন্নয়ন বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। অর্থাৎ, কালের বিবর্তনে উন্নয়ন ধারণার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন - অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত উন্নয়ন ধারণা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর উন্নয়ন ধারণায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এমন কি পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের উন্নয়ন ধারণা এবং সত্তর দশকের উন্নয়ন ধারণা এক নয়।[২] যেমন - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মোট জাতীয় উৎপাদনকে উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। জাতিসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কমিটি দ্বিতীয় উন্নয়ন দশক প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করে যে, মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) এর ভিত্তিতে বর্তমান

দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন একটি মৌলিক লক্ষ্য।[৩] ফলে দেখা যায় যে, উন্নয়ন ধারণাটি ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত আকারে সময়ের পরিবর্তনে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে যেখানে উন্নয়ন কৌশল হিসেবে প্রবৃদ্ধিকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হতো সেখানে শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্নরূপে বিবেচিত হয়েছে। আবার সুইডিশ অর্থনীতিবিদ মাইকেল টোডারোর মতে, উন্নয়ন হচ্ছে একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যা সামাজিক কাঠামো, জনগণের মনোভাব ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে অন্তর্ভূক্ত করার পাশাপাশি বৈষম্যতা হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার সহিত সংশ্লিষ্ট।[৪] লুসিয়ান পাই এর অভিমত হলো, উন্নয়ন সাম্যতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, যুক্তিযুক্ততা ও অংশগ্রহণ সম্প্রসারণের সহিত সংশ্লিষ্ট।[৫] উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উন্নয়ন বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে এডওয়ার্ড ডব্লিউ উইডনার এর মতামত হলো, উন্নয়নশীল দেশের জন্য উন্নয়ন আধুনিকীকরণের পথে শুভযাত্রা আর জাতিগঠন ও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন।[৬] উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উন্নয়ন কথাটি বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবেচিত হয়েছে। কেউ হয়তো সামাজিক উন্নয়নের কথা বলেছেন, কেউ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন। আবার অন্য কেউ হয়তো উন্নয়ন বলতে রাজনৈতিক উন্নয়নকেই বড় করে দেখেছেন। এমনিভাবে অন্য কারো নিকট হয়তো ভিন্ন একটি বিষয় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তবুও বলতে হয় যে, এরূপ সামান্য ভিন্নতা থাকলেও তাদের চিন্তাধারায় যে, ব্যাপক মিল রয়েছে একথা অনায়াসেই বলা যায়। কেননা সকলের মৌলিক চিন্তা ছিল জনগণের সার্বিক কল্যাণ। এরূপ সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের জন্য হয়তো বিভিন্ন জন বিভিন্ন পথের কথা বলেছেন বা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এদের উপায় বা পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য এক। এছাড়া সময়ের বিবর্তনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আজকে যে পথ/উপায় সঠিক মনে হয় আগামীতে তা নাও হতে পারে। তাই

উন্নয়নকে কোন ঘটনার সর্বশেষ অবস্থা বা পর্যায়কে বিবেচনা করা যায়। উন্নয়নকে আমরা নিম্নোক্তভাবে বিবেচনা করা হতে পারে:

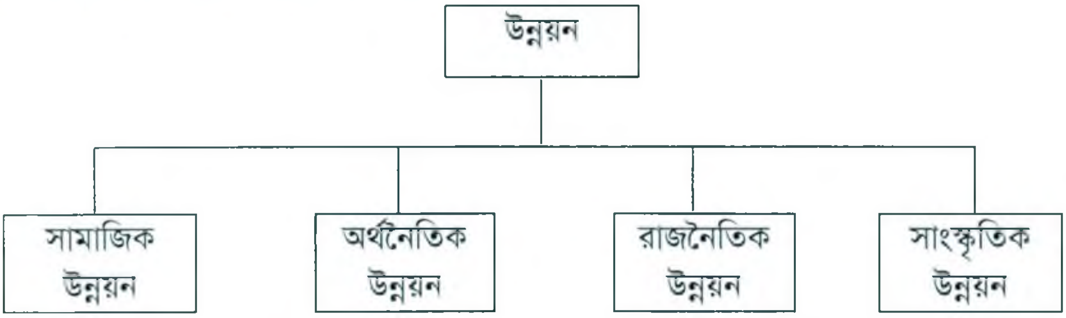

উন্নয়নকে কোন নির্দিষ্ট ধারণা বা গন্ডির মধ্যে সীমিত না রেখে সমাজের সার্বিক দিক থেকে বিবেচনা করা দরকার। উন্নয়নকে দেখতে হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে। নিচে এসব দিক দিয়ে উন্নয়ন বলতে কি বুঝায় তা উপস্থাপন করা হলো:

২.১.১ সামাজিক উন্নয়ন

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গত কয়েক দশকের উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতার ফল হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন ধারণা। উন্নয়ন সম্পর্কিত আধুনিকায়ন ও মার্কসীয় মতবাদের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ, বৃটিশ ঔপনিবেশিক কল্যাণ প্রশাসন, সমাজকর্ম স্কুল সমূহের আন্তর্জাতিক সমিতি এবং আন্তর্জাতিক সামাজিক উন্নয়নের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কনসোর্টিয়াম কর্তৃক সমষ্টি উন্নয়ন ও জনগণের অংশগ্রহণ, 'সমন্বিত উন্নয়ন', 'বন্টনভিত্তিক প্রবৃদ্ধি', 'মৌল মানবিক প্রয়োজন পূরণ', ইত্যাদি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতিতে "সামাজিক উন্নয়ন" ধারণা ও প্রক্রিয়ার উৎপত্তি।[৭] সামাজিক উন্নয়ন এমন একটি প্রচেষ্টা বা পদক্ষেপ যার মাধ্যমে সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে সার্বিক উন্নয়নকে তরান্বিত করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে গার্থ ও মিলস বলেন - সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রকার রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে অনুন্নত অবস্থা থেকে যখন উন্নত পর্যায়ে আসীন হয়, তখন তাকে সামাজিক উন্নয়ন বলে।[৮] অন্যভাবে বলা যায় যে, সামাজিক উন্নয়ন হলো পরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন যার মাধ্যমে সামাজিক প্রয়োজন ও কর্মসূচীর মধ্যে সুসমন্বয় আনয়ন করা সম্ভবপর হয়। আর এই সুসমন্বয় আনয়নের জন্য প্রয়োজন হয় ব্যাপক, বিভিন্নমুখী ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মোটকথা দেশ বা সমাজের সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্য, গৃহ, পুষ্টি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উপার্জন ক্ষমতা, অপরাধ দমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামাজিক নীতি, কর্মসূচী ও সেবাদান পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণ সাধন নিশ্চিতকরণই হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্বীকৃত পদ্ধতির হচ্ছে সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা, মানব সম্পদ উন্নয়নসহ সচেতনায়ন ও ক্ষমতায়ন, সামাজিক কার্যক্রম, সামাজিক ওকালতি, মূল্যায়ন গবেষণা, ইত্যাদি।[৯] আর এসব ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হলেই সামাজিক উন্নয়ন বলে বিবেচনা করা হয়।

২.১.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে দেশের সার্বিক আর্থিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনকেই বুঝানো হয়। আর আর্থিক অবস্থা বলতে বুঝে থাকি জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ক্ষমতা, ক্রয় ক্ষমতা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদিকে। সুতরাং, উল্লিখিত চলকগুলোর পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে ইতিবাচক পরিবর্তনকে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে অভিহিত করতে পারি। তবে এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের মতের কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। উইলিয়াম ও বাট্রিকের মতে, “কোন দেশ বা অঞ্চলের জনসাধারণ বর্তমান সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে যে উপায়ে মাথাপিছু উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।[১০] অর্থাৎ, প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি মানেই

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অধ্যাপক রস্টো এর মতে, মৌলিক বিজ্ঞান সমূহের উন্নতির প্রবণতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য বিজ্ঞান ব্যবহারের প্রবণতা, নতুন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিস্কারের প্রবণতা, উপভোগ অথবা সঞ্চয়ের প্রবণতা, এবং সন্তান লাভের প্রবণতার মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিহিত।[১১] অন্যদিকে মায়ার ও বল্ডইউনের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যাহা দ্বারা অর্থনীতির প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১২]

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে প্রদত্ত বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের মতামত পর্যালোচনা করলে তাদের মতের মধ্যে কিছুটা যেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে তেমনি সময়ের বিবর্তনেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন - গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা ছিল প্রধানতঃ আধুনিকীকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং মাথাপিছু আয়কে ধরা হতো প্রবৃদ্ধির মুখ্য নির্দেশকরূপে। আর সত্তর দশকে উন্নয়ন প্রত্যয়ে সংযোজিত হয় ন্যায় সঙ্গত বন্টন ও মৌল চাহিদা পূরণ। কিন্তু বর্তমানকালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও মৌল চাহিদা পূরণকে আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলসূত্র হিসেবে গ্রহণ না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দেখা হয় এক বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে।[১৩] এই বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উপাদান হলো (ক) জনগণের বিশেষ করে অনগ্রসর ও বঞ্চিতদের মৌল চাহিদা পূরণ, (খ) সামাজিক পর্যায়ে শ্রেণী ও স্থানগত বৈষম্য দূরীকরণ, (গ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি।[১৪] সুতরাং, বলা যায় যে, অর্থনেতিক উন্নয়ন একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতির নির্দেশ করে যাহা কতিপয় শক্তির কার্যকলাপের সাথে জড়িত। বাংলাদেশের অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস.) কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা স্বাধীনতার পরবর্তী পুরো সময়টাতে মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত গবেষণা প্রতিবেদনে থেকে জানা যায় যে, ১৯৬০-৭১ সময়কালে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যেখানে ৫% সেখানে ১৯৭২ -৮২ এই বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল

Dhaka University Institutional Repository

২.২%; ১৯৮২-৯০ এবং ১৯৯১-৯৭ সময়কালে এই হার ছিল যথাক্রমে ১.৫% ও ৩.২% এবং ১৯৯৮ সালের শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যার নেতিবাচক প্রভাব সত্বেও এই হার ছিল আরো বেশি এবং উৎসাহ ব্যাঞ্জক। ১৯৯৬-৯৯ সময়কালে সামগ্রিকভাবে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৫.৫% যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৮% যা অবশ্যই বলতে হয় সন্তোষজনক।[১৫] তবে হঠাৎ করে একটি দেশের মাথাপিছু আয় বা মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেই বলা যায় না যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। বরং যদি সুদীর্ঘকাল ধরে এ বৃদ্ধি ক্রমাগতভাবে অব্যাহত থাকে অর্থাৎ, দেশের প্রাপ্তব্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায়।

২.১.৩ রাজনৈতিক উন্নয়ন

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রত্যাশিত উন্নয়ন না হবার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা কতটুকু দায়ী কিংবা অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব কতটুকু সে সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কেননা রাজনৈতিক উন্নয়নের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল, না-কি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর রাজনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল সে ব্যাপারে অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে তাত্ত্বিকেরা রাজনৈতিক উন্নয়ন ধারণাটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। স্যামুয়েল হান্টিংটন এর মতে "রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রক্রিয়াগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাত্রা যত বেশি হবে, উক্ত ব্যবস্থায় ততো বেশি রাজনৈতিক উন্নয়ন সংগঠিত হয়েছে বলে মনে করা হবে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

ইতোপূর্বে সম্পাদিত গবেষণা হতে জানা যায় যে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত একটি সমাজের পক্ষেই উন্নত রাজনীতি তৈরি ও ধারণ করা সম্ভব হয়।[১৭] কেনেথ অরগানাস্কি তাঁর *The Stages of Political Development* - এ রাজনৈতিক উন্নয়নের যে চারটি স্তর উল্লেখ করেছেন তা হলো: (১) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য রাজনৈতিক একত্রীকরণ (২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন (৩) জাতীয় কল্যাণ আনায়ন- যাতে জনগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুফল ভোগ করতে পারে। (৪) জনগণের উন্নত বস্তুগত জীবনমান।[১৮] অর্থাৎ, বলা যায় যে, রাজনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা রাজনৈতিক একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুফল নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি করা। সেইমুর মার্টিন লিপসেট (Seymour Martin Lipset) পাঁচ দশকের শেষ দিকে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শিল্পায়নের মাত্রা যে দেশে উচ্চ, তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক লোক শহরে বসবাস করে, অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে, এরূপ দেশে গণতন্ত্রের সফলতার সম্ভাবনা অধিক।[১৯] অর্থাৎ মার্টিন গণতন্ত্রে মাত্রা দ্বারা রাজনৈতিক উন্নয়নকে পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন এবং গণতন্ত্রায়ণ এর সফলতার পূর্ব শর্ত বা গণতন্ত্রের উচ্চ সফলতার জন্য উচ্চ শিল্পায়ন, অধিক শিক্ষার হার, অধিক শহরায়ন এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কথা উল্লেখ করেছেন। লিপসেটের প্রদত্ত মন্তব্যের ভিত্তিতে ফিলিপ্স কাটরাইট জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অগ্রগতির সূচক নির্ধারণ সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গণসংযোগ ব্যবস্থা, শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের পরিমাণ ও শ্রমিকদের সংখ্যা ও প্রকারভেদ প্রভৃতির উপর।[২০] তাঁর মতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিই রাজনৈতিক অগ্রগতির মূল ভিত্তি। আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে বলা যায়

যে,এখনও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ, অসহনশীলতা ও শ্রদ্ধাহীনতার বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নকেই বুঝায়। অর্থাৎ, বলা যায় যে, রাজনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপের কাঠামোগত ও গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

২.১.৪ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সংস্কৃতি হলো জীবনের দর্পন, মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রুত জীবন চেতনা, চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তি। আর এ গুলোর উন্নয়নকেই বলা হয় সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।[২১] প্রতিটি সমাজেই কিছু নিজস্ব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী থাকে যা ঐ সমাজের জনগণের মানসিক কৃষ্টি গড়ে তোলে। এই মূল্যবোধ বা মানসিক কৃষ্টি লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় যে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ বা আদর্শের উপস্থিতি রয়েছে সেগুলোকে স্ব-স্ব সংস্কৃতির নিজস্ব স্বকীয়তা ও মূল্যবোধ দিয়ে ইতিহাসের আলোকে বিবেচনা করে গণমানুষের জীবন চেতনার সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে ইতিবাচক প্রভাব আনতে সক্ষম হতে পারলেই সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

একটি দেশের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রের কাংখিত উন্নয়ন ঘটিয়ে সে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সাধন সম্ভবপর। অর্থাৎ, কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে কোন এক বা দুইটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বরং উপরিউক্ত সবগুলো দিকের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো অত্যাবশ্যক। আর সেটা সম্ভব হলেই অর্জিত হবে কাংঙ্খিত লক্ষ্য। অর্থাৎ, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সমষ্টিই হচ্ছে দেশের সামগ্রিক বা জাতীয় উন্নয়ন। অন্যভাবে বলা যায় যে, উন্নয়ন হলো সার্বিকভাবে জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাথে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, শিক্ষা ও

স্বাস্থ্যের সম্প্রসারণ এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগের পথ উন্মুক্ত করার একটি সম্পর্ক রয়েছে।[২২]

পরিশেষে বলা যায় যে, উন্নয়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ, সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ইত্যাদির উন্নয়নের মাধ্যমে, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগের পথ উন্মুক্ত করে শোষণের পথ ও স্বল্পলোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার পথ রুদ্ধ করে জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনকল্যাণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়।

২.২ উন্নয়ন কৌশল ধারণার ক্রমবিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন দেশের জনগণের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক তত্ত্ব বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। কিন্তু এসব অর্থনৈতিক তত্ত্বে উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সমানভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য নারী উন্নয়ন নীতিমালা যেমন উন্নয়নে নারী (WID), নারী ও উন্নয়ন (WAD) এবং জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD) -এই ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয় যা জাতীয় ও আন্তজার্তিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। নিম্নে উন্নয়নে নারী, নারী ও উন্নয়ন এবং জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

২.২.১ উন্নয়নে নারী

সত্তরের দশকে আধুনিকায়ন তত্ত্বের সমালোচনার প্রেক্ষিতে উন্নয়নে নারী নীতিমালার উদ্ভব হয়। আধুনিকায়ন তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, আধুনিকায়নের সুফল নারীদের কাছে নিজ থেকেই পৌঁছাবে। কিন্তু দেখা গেল যে আধুনিকায়নের সুফল পুরুষদের কাছে যেভাবে পৌঁছিয়েছে নারীর

Dhaka University Institutional Repository

কাছে তা সমানভাবে পৌঁছায়নি। ঐ সময় প্রখ্যাত নারীবাদী লেখক ইষ্টার বোসেরাপ তাঁর "অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা" গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে, ৬০-৭০ এর দশকের উন্নয়নের সুফল নারীদের কাছে পৌঁছেছে অনেক কম।[২৩] অতএব বলা চলে যে আধুনিকায়ন তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নে নারী নীতিমালা প্রণীত হয়। গত কয়েক দশকে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে স্থান পেয়েছে। পৃথিবীতে নারীরা সংখ্যার অর্ধেক হলেও উন্নয়নমূলক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীল খাতে নারীর পশ্চাদপদতা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা, বিশ্বসম্পদের মালিকানায় তাদের অবস্থান পুরুষের চেয়ে অনেক কম।

বিভিন্ন সম্মেলনে উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সালে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত আন্তজার্তিক নারী সম্মেলনে উন্নয়নে নারীর ভূমিকাকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং সকল সমাজের নারীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য উন্নয়নে নারীকে একটি মৌলিক ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা একমত পোষণ করেন যে, এক্ষেত্রে দৃশ্যমান অর্জন সীমিত, নারীর স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ঘটেছে এবং গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিশ্বের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ৬০% এখনও নারী। আয় অর্জনের ক্ষেত্রেও তারা পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে এবং কর্মহীনতার হারও বেশী।[২৪] তবে আশার কথা এই যে এ দশকে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত ক্ষেত্রে কিছুটা অধিকার অর্জন হয়েছে।

২.২.২ উন্নয়নে নারীর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ

জাতীয় ও আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নে নারী নীতিমালারও পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নে নারী নীতিমালার উদ্ভব হয়েছে। এগুলো হলো-

১। কল্যাণমূলক এ্যাপ্রোচ;

২। সমদর্শী এ্যাপ্রোচ;

৩। দারিদ্র বিমোচন এ্যাপ্রোচ;

৪। দক্ষতা এ্যাপ্রোচ; ও

৫। ক্ষমতায়ন এ্যাপ্রোচ।[২৫]

কল্যাণমূলক এ্যাপ্রোচঃ কল্যাণমূলক এ্যাপ্রোচ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রচলিত নারী উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ্যাপ্রোচ। এই এ্যাপ্রোচের মূল উদ্দেশ্য হলো এখানে নারী পরিচিত হতো একজন মা বা গৃহবধুরূপে। নারীকে এখানে উন্নয়নের মূল চালিকা হিসেবে দেখা হয় না। কল্যাণমূলক এ্যাপ্রোচে ধরেই নেয়া হয় যে, নারী এখানে সন্তান লালন-পালন এবং গৃহকর্ম ও পরিবারের মাধ্যমেই সে তার ভূমিকা পালন করবে।

সমদর্শী এ্যাপ্রোচ: এই এ্যাপ্রোচের মূল লক্ষ্য হলো নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জন। সমদর্শী এ্যাপ্রোচে বলা হয় এখানে নারীর উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং পুরুষের সমান ভাগীদার হবে।

দারিদ্র বিমোচন এ্যাপ্রোচঃ দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাপ্রোচের লক্ষ্য হলো দরিদ্র নারীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এই এ্যাপ্রোচ অনুযায়ী নারীই হলো দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম এবং সে অনুযায়ী নারীর আয়, উপার্জন, ও ক্ষুদ্র ঋণের দ্বারা তার মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা বলা হয়।

দক্ষতা এ্যাপ্রোচঃ দক্ষতা এ্যাপ্রোচের উদ্ভব ঘটে ৮০ এর দশকে এবং বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রাধান্য বিস্তারকারী এ্যাপ্রোচ হচ্ছে দক্ষতা এ্যাপ্রোচ। এই এ্যাপ্রোচের মূল লক্ষ্য হলো নারীর অর্থনৈতিক অবদানের মাধ্যমে উন্নয়নকে যেন আরো দক্ষ ও কার্যকর করে

তোলা যায় তা নিশ্চিত করা এবং নারীকে উন্নয়নের প্রান্ত থেকে উদ্ধার করে মূলধারায় নিয়ে আসা।[২৬]

ক্ষমতায়ন এ্যাপ্রোচঃ ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্য ও তৃণমূল সংগঠনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভব ঘটে ক্ষমতায়ন এ্যাপ্রোচ। এই এ্যাপ্রোচের মূল কথা হলো নারীর আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি করা যাতে নারী আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

ক্ষমতায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) এর সংজ্ঞায়। (DAWN) এর মূল উদ্দেশ্য হলো এমন এক পৃথিবী গঠন করা যেখানে প্রত্যেকটি দেশে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সর্ম্পক এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য থাকবে না। এই ভবিষ্যৎ পৃথিবী গঠনের দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা এসে পড়ে। যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে।[২৭]

২.২.৩ উন্নয়নে নারী নীতিমালা কর্মকৌশল

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীকে কিভাবে আরো বেশি সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করা যায় এবং সেই সাথে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনই মূলতঃ নারী নীতিমালার লক্ষ্য। উন্নয়নে নারী কৌশলে আবার প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional) এবং কার্যক্রমিক (Operational)) এই দুইটি প্রধান ধরন ব্যবহৃত হয়। আবার এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল হলো ইনপুট সাইড এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো উন্নয়নে নারী পলিসি এবং পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন এজেন্সী এবং সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন। উন্নয়নে নারী/জেন্ডার এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত দায়িত্ব, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং কর্মী নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন হাতিয়ার এবং

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলের অর্ন্তভুক্ত। অন্যদিকে অপারেশনাল কৌশলের মধ্যে পড়ে গাইড লাইন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, বিশেষ প্রকল্প, বিশ্লেষণমূলক হাতিয়ার, সামষ্টিক পলিসি এবং পলিসি ডায়ালগ সংক্রান্ত ইত্যাদি ব্যাপারে বিভিন্ন এজেন্সী ও সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত ও উন্নয়নকৃত বিভিন্ন ফল কেন্দ্রিক পদক্ষেপ/পরিমাপ।[২৮]

২.২.৪ নারী ও উন্নয়ন

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের উন্নয়নে নারীর অবস্থান বা অংশগ্রহণ যেমন সীমিত, তেমনি যেটুকুও রয়েছে তারও কোন সঠিক পরিসংখ্যান বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। তাছাড়া উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারে কোন নীতিমালাও ছিল না। অথচ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। দেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত থাকলেও বাস্তবে তার তেমন প্রতিফলন দেখা যায় না। প্রায় সকল সমাজেই নারী সবদিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে অনেক নিচে এবং নারীকে নিকৃষ্ট ভাবা হয়। তবে উন্নত বিশ্বের নারীর বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে এখন আর এ অবস্থা সহসা চোখে নাও পড়তে পারে। কারণ ঐসব উন্নত সমাজে এ শৃংখল এখন অনেকটাই ভেঙ্গে নারী বের হয়ে আসতে পেরেছে। তারা পুরুষের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে দেশের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নারীর অবস্থার তেমন একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। ফলে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয় বাঁধার যা পুরুষের ক্ষেত্রে থাকে না। আর এজন্য নারী শিকার হন বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়নের এবং তাদের স্বীকৃতি মিলে সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে। গত দুই দশকে এ অবস্থার বিরুদ্ধে নারীরা সোচ্চার হয়েছে এবং নারীবাদীরা তাদের লেখা, গবেষণা, বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, মেয়েরা অনেক কাজে পুরুষদের চেয়ে দক্ষ এবং সুযোগ পেলে তারা তাদের দক্ষতার প্রমাণ রাখতে

পারে।[২৯] তেমনি নারীরা যদি উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারতো তবেই তাদের প্রকৃত মুল্যায়ন হতো। তাছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিহীন অবস্থায় নারীরা যতই পুরুষের সম-অধিকার দাবি করুক না কেন এবং এজন্য যতই আইন পাশ, নীতি নির্ধারণ, সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হোক না কেন তা শুধু কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যৌক্তিক কোন পরিণতি লাভ করবে না। তাই নারীর সমতা অর্জন এবং তা বিকশিত করার একমাত্র পথ হচ্ছে নারীর প্রতি নিজস্ব ও সামাজিক মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তন সাধন এবং নারীরা কীভাবে পিতৃতন্ত্রের দ্বারা প্রথাগতভাবে নিপীড়িত হয় তার যথাযথ উপলব্ধিকরণ।[৩০] ৭০ দশক থেকে নারীর অবস্থার উন্নয়নে অনেক নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা সোচ্চার হতে থাকেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়নে নারীর অবস্থান সম্পর্কে প্রথম স্বীকৃতি আসে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী দশকের প্রাক্কালে। তারপরও বলা যায় যে, গত শতাব্দীতে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে অনেক পরিবর্তন আসলেও নারী উন্নয়নে কিছু বিধি-বিধান ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। ফলে নারী সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে পুরুষের অধঃস্তন হয়ে পড়েছে। নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অভাব পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা হ্রাস করেছে; অর্থনৈতিক পরিমন্ডলেও নারীর গৃহের কাজ অদৃশ্য, স্বীকৃতিহীন ও পারিশ্রমিকবিহীন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে তাদের কাজ কম দামী ও অবমূল্যায়িত।[৩১]

গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারীদেরকে উন্নয়নের আওতায় আনার চেষ্টা করলেও সেক্ষেত্রে নানা বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হচ্ছে:[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

ক) স্বামীর তরফ থেকে বাধা;

খ) পিতামাতা - ভাইবোনদের তরফ থেকে বাধা;

গ) স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে বাধা;

ঘ) ধর্মীয় নেতাদের তরফ থেকে বাধা;

ঙ) উন্নয়নকারী বিভাগের কর্মকর্তাদের অনীহা;

চ) বিশেষজ্ঞদের তরফ থেকে বাধা;

ছ) স্ব-আরোপিত নিষেধাজ্ঞা; ও

জ) তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব।

তবে একথা সত্য যে, অতীতে যেখানে উন্নয়নের ধারায় নারীদের চাহিদা, মতামত বা অধিকার পদ্ধতিগতভাবে উপেক্ষিত হতো বা কখনও বিবেচনা করা হলেও তা থাকতো অগ্রাধিকার তালিকার সর্বশেষে, সেখানে বর্তমানে সীমিত পর্যায়ে হলেও উন্নয়ন পরিমন্ডলে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমশঃ দৃশ্যমান এবং তা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপরও একজন পুরুষ কর্তৃক তার স্ত্রীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করাটাকে সব সমাজেই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয় অথচ বিবাহিত স্ত্রীও যে স্বামী কর্তৃক ধর্ষিত হতে পারে তা স্বীকার করা হয় না; কিন্তু অনেক নারীই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সাক্ষী।[৩৩] Women for Women প্রকাশিত নারী ও উন্নয়ন-প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান গ্রন্থে বলা হয়েছে “বাংলাদেশের উন্নয়নে নারী সমাজের স্থায়ী অংশগ্রহণ ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে হলে নারী পুরুষ সমদর্শিতার আলোকে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডকে পরিচালিত করা প্রয়োজন।[৩৪] সুতরাং, বলা যায় যে, উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি আজ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার সময় এসেছে। অতীতে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণে ব্যর্থতা বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করতে হবে যাতে নারী দেশ, জাতি তথা ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব।

২.২.৫ উন্নয়ন ও জেন্ডার ইস্যু

উন্নয়ন দর্শনে একথা আজ সুস্পষ্ট যে, উন্নয়ন নিছক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, এর প্রকৃত অর্থ মানব উন্নয়ন যা নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিকে অর্থাৎ, জেন্ডার প্রেক্ষিতটিকেও ধারণ করে।[৩৫] এটা স্বীকৃত বাস্তবতা যে, সমাজের অন্যান্য অংশের তুলনায় দরিদ্র নারীরাই অধিক হারে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অবনতির ধকল পোহায় এবং এর ফলে তুলনামূলকভাবে নারীদের সম্পদ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে সুযোগ আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে।[৩৬] ফলে বর্তমান প্রচলিত উন্নয়ন ধারা নারীর জীবনে কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলার পরিবর্তে বিপরীত বা নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বৈষম্যের এই বিষাদময় বাস্তবতার কারণে নারী পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র কোথাও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরী কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না বলে। তবে ইদানিং নারীর উন্নয়ন কর্মকান্ডকে পরিমাপ করা হচ্ছে, এতদিন যে নারী ছিল অপাঙক্তেয়, সেই নারীই আজ সাহায্য শিল্পের বদৌলতে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে এবং ১৯৯৫ সন থেকে নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপের লক্ষ্যে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে জেন্ডার সম্পর্কিত সূচক সংযুক্ত করা শুরু হয়েছে। এই সূচকগুলো দ্বারা প্রতিটি দেশে নারী উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা, নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন কতটা অর্জিত হল এবং বিশ্বব্যাপী জেন্ডার বৈষম্য কতটা দূরীভূত হল তার একটা হিসাব নির্দেশ করা হয়।[৩৭] জেন্ডার উন্নয়ন সূচক দ্বারা যদি বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করি তবে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে। ১৯৯৬ সনের জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৩৭টি দেশের মধ্যে জেন্ডার উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্রমিক মান ১১৬, ভারত ১০৩, পাকিস্তান ১০৭, শ্রীলঙ্কা ৬২ এবং মালদ্বীপ ৮০।[৩৮] এ তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, জেন্ডার উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যেও অনেক পিছিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে যে বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো জেন্ডার উন্নয়ন সূচক দ্বারা দেশের অবস্থান নির্ণয় করলেই অবস্থার উন্নয়ন হবে না। এজন্য প্রয়োজন অবস্থার উন্নয়নের জন্য বাস্তবমুখী নীতিমালা ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন।

বিগত এক শতাব্দী কালেরও বেশি সময় ধরে পুরুষ প্রাধান্যশীল, উপনিবেশিক, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির হুকুমদারী শাসন ব্যবস্থার ফলে গৃহবধূ সম্পর্কে একটি মিথ (Myth) গড়ে উঠেছে এবং তা এমন এক আদর্শ নারীর ছবি চিত্রিত করেছে, যিনি গৃহকোণে অবস্থান করে তার স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে তার সন্তানদের লালন-পালন করেন।[৩৯] অথচ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে নারী প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষের পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, পুরুষের শ্রম আর্থিক মানদন্ডে বিবেচনায় আসে, আর নারীর শ্রমটা থাকে আর্থিক মানদন্ডে বিবেচনার বাহিরে। ফলে নারীকে বিনা মজুরীতে বা স্বল্প মজুরীতে নিজের বা পুরুষের জন্য বা অন্যান্যদের জন্য পরিশ্রম করে যেতে হয়। ফলে সমাজে একমাত্র নারীকেই উৎপাদনমূলক, পুনঃউৎপাদনমূলক ও সামাজিক সব ধরনের কাজই করতে হয়। যেমন- গৃহে সন্তান ধারণ ও লালন-পালন, পিতামাতা, সন্তান, স্বামীর দেখাশুনা করা, গৃহে খাদ্য সামগ্রী তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সংসারের আর্থিক প্রয়োজনে অনেক সময় শারীরিক ও মানসিক শ্রম বিক্রি করতে হয়। প্রচলিত জেন্ডার অসচেতনতা বা অজ্ঞ উন্নয়ন ধারা নারীর জীবনে যে, দু'টি মারাত্মক ধকল বয়ে এনেছে তা হলোঃ একদিকে নারীর কাজের বোঝা দ্বিগুণ হয়েছে, অন্যদিকে নারীর দায়-দায়িত্বে বাধ্যবাধকতা বা বন্ধনে দ্বিগুণ হয়েছে।[৪০] বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীই তাদের সমগ্র জীবনে তিনভাবে হীনতার জোয়াল কাঁধে বহন করে; প্রথমতঃ তারা তৃতীয় বিশ্বের সদস্য হবার দরুন; দ্বিতীয়তঃ এদেশের গরীব জনগোষ্ঠীরূপে; এবং তৃতীয়তঃ সমাজের নারী হিসেবে।[৪১] জেন্ডার ও উন্নয়ন নারীরা যে সব অপ্রত্যাশিত উন্নয়ন সমস্যার সম্মুখীন হয় তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দু'টি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ স্থাপন করে:[৪২] (ক) নারীর উপর উন্নয়নের কী প্রভাব ও

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের বিরূপ ফলাফল হ্রাসের ক্ষেত্রে কি করণীয় তা বিশ্লেষণ করে এবং তাদের জীবনে আরো স্বাধীকার ও ক্ষমতা প্রদান করে; (খ) নারীই যে উন্নয়নের মূল সম্পদ- এই হারানো যোগসূত্রটি তুলে ধরা।

নারী দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কতটা অবদান রাখতে পারে তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে তৈরি পোশাক শিল্প। এই অবদান প্রায় মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬%। এই বৃহৎ শিল্পে যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে তার সিংহভাগই নারী। আর এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ লাভের পিছনে নারীর সস্তা শ্রমই সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।। ফলে একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নারীও যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো বাংলাদেশের পোশাক শিল্প। আর এই পোশাক শিল্পের সফলতায় নারীর অবদান যেমন-স্পষ্ট তেমনি এই পোশাক শিল্পের দিকে তাকালেই নারীর মর্যাদা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বীকৃতির অবস্থা সম্পর্কে ধারণাও স্পষ্ট হয়ে উঠে। যে নারীর দিন-রাত পরিশ্রমের ফলে পোশাক শিল্পের এই সফলতা, সেই নারীই মাসিক যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পান তা দিয়ে ভালভাবে তার একা চলাই সম্ভব নয়। তবুও সে কাজ করছে এই আশায় যে, এই সামান্য উপার্জন তার স্বামী বা পিতার আয়ের সাথে যোগ হয়ে তার পরিবারে কিছুটা হলেও আর্থিক স্বচ্ছলতা বয়ে আনবে। এরপরও তাদের এবং তাদের পেশার সামাজিক স্বীকৃতি তাদের তেমন একটা মিলছে না। প্রায় একই অবস্থা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও। গোটা বিশ্বে নারী মোট কাজের দুই-তৃতীয়াংশ সম্পাদন করে, ১০ ভাগ আয় ভোগ করে এবং বিশ্ব সম্পদের এক ভাগের তারা মালিক এই পরিসংখ্যান তথ্যের দ্বারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রকৃতিটি উন্মোচিত হয়েছে ভালভাবেই।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

যখন জাতীয় বা সাংগঠনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় তখন তার প্রভাব কি হতে পারে তা জেন্ডার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা উচিত। এই জেন্ডার বিশ্লেষণের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হলো নিম্নোক্ত ৬টি 'R' কে বিবেচনা করারঃ[৪৪]

ক) Role - সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা ভূমিকা;

খ) Responsibilities - কাজকর্ম, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব, কাজের বোঝা;

গ) Resources - নিছক সম্পদ নয়, সম্পদের দাবি, শিক্ষা, ক্ষমতা এগুলো;

ঘ) Risks - ঝুঁকি বা কোন কর্মসূচির ধকল;

ঙ) Responses - প্রকল্প বা কোন হস্তক্ষেপের প্রতি সাড়া বা প্রতিক্রিয়া, অংশগ্রহণের দরুন প্রণোদনা বা উৎসাহ প্রদান; এবং

চ) Reward - পুরস্কার, উন্নয়নের সুফল কিংবা অভিজ্ঞতা অর্জন।

উন্নয়ন কর্মকান্ডে জেন্ডার ইস্যু বিশ্লেষণে উল্লিখিত ৬টি 'R' বিবেচনা করা অতীব প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। কেননা প্রতিটি সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে আরো বেশি স্পষ্ট। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ যেমন সীমিত, তেমনি তাদের সীমিত অংশগ্রহণও আবার সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় না। তাছাড়া নারী ও পুরুষের দায়িত্বেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। অনগ্রসর নারীর উন্নয়নে যদি কখনও কোন সমাজ বা অর্থনীতিতে প্রণীত পরিকল্পনায় পরিকল্পিত হস্তক্ষেপ করা হয় তবে সেক্ষেত্রেও যে, এই বৈষম্যের ব্যত্যয় ঘটে তা বলা যাবে না। ফলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী যে পুরুষের মত সমান উৎসাহী বা আগ্রহী হবে এটা আশা করা যায় না। এজন্য দেশের পরিকল্পনাবিদদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যাতে উন্নয়নের সুফল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমানভাবে ভোগ করতে পারেন। অন্যথায় উন্নয়ন সম্পর্কিত ইতোপূর্বে গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য নীতিমালার ন্যায় উন্নয়নে নারী (WID) এই নীতিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হবে। এজন্য প্রয়োজন উন্নয়নে নারী এই নীতিটির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা দূর করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কেননা এই নীতিতে দেখা গেছে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচীতে নারীকে গৃহের ও চারপাশের অন্যান্য কাজ থেকে অব্যহতি না দিয়ে বা হ্রাস না করে তাদের শ্রম বাজারে প্রবেশ করানো হচ্ছে। এতে নারীর কাজের পরিমাণ দ্বিগুণ হচ্ছে। ফলে নারী শোষণ ও নির্যাতনে নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে যা নারীকে মুক্তির পরিবর্তে আরো নতুন নতুন ধকল সহ্য করতে হচ্ছে। ফলে নারী পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি ভেঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শৃংখল থেকে বের হয়ে আসার পথকে রুদ্ধ করছে এবং নারীর অধঃস্তনতাকে আরো পাকাপোক্ত করছে।

২.৩ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান

নারী পুরুষের সংগী হিসেবে আবহমান কাল থেকেই কাজ করে আসছে। কিন্তু নারী সাধারণতঃ কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকলেও তার যথাযথ স্বীকৃতি নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রেই তারা অর্থনৈতিক কাজে জড়িত থাকলেও উন্নয়নের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই উন্নয়ন কর্মকান্ডেও আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের সর্বত্রই এই সত্যটি উপলব্ধ হয়েছে যে, নারীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রধান ধারার সংগে সম্পৃক্ত করতে না পারলে কোন দেশ বা জাতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।[৪৫] এরূপ উপলব্ধি থেকেই নারী উন্নয়ন তথা ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের সমান অংশগ্রহণের জন্য ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনে এর উপর জোর দেয়া হয় এবং নারীকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। নারী পুরুষের মধ্যকার এ বৈষম্য দূর করে নারী-পুরুষ সমতার ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই সত্যিকার অর্থে নারী উন্নয়ন সম্ভব হবে। সুতরাং, উন্নয়ন

প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মূল হাতিয়ার হল ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ।[৪৬]

জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশ নারী হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী বর্তমান বিশ্বে এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, যদিও বর্তমানে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে তবুও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় সুইডেনের নিম্ন পরিষদে নারীর হার সর্বোচ্চ শতকরা ৪০.৪ ভাগ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে মহিলাদের অগ্রগতি সাধনে জাতিসংঘের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘ সচিবালয়ের উর্ধ্বতন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে কিছুটা অগ্রগতি হলেও ২০০০ সাল নাগাদ শতকরা ৫০ ভাগে উপনীত হবার লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।[৪৭]

বিভিন্ন নারী সংগঠন বিভিন্ন সময়ে নারী যেন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তাই সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায় যে, "Some urban based women's organizations are working for the emancipation of women and trying to create pressure on the government and society to formulate appropriate national policies regarding improvement of women's economic and legal status".[৪৮]

বাংলাদেশে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদে প্রথম বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন একজন নারী। ১৯৯১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী বা সংসদনেতা এবং প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা/ সংসদের প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ই নারী। তারপরও দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী

Dhaka University Institutional Repository

কমিটিতে নারীর সংখ্যা-স্বল্পতা। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পুরুষরাই প্রাধান্য বিস্তার করে। তাছাড়া যে সমস্ত নারী স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে এসেছেন তারাও হয় উত্তরাধিকারসূত্রে পরিবারকেন্দ্রিক অথবা এলিট শ্রেণী থেকে আগত।[৪৯] জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দেখা যায় যে মহিলাদের জন্য যেহেতু সংসদে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাই সরাসরি নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো থেকে মহিলাদের মনোনয়নদানে অনীহা থাকে। সরকারী ও প্রধান বিরোধী দলের নেতৃত্বে নারী আসীন থাকা সত্বেও মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত অর্থাৎ, এটা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে না-কি পূর্বের ন্যায় সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবে সে ব্যাপারে কোন ঐক্যমত্যে পৌঁছুতে পারছেন না। ফলে নারী রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া জাতীয় সংসদে কিছু নারী প্রতিনিধি থাকা সত্বেও বিভিন্ন নেতিবাচক উপাদান যেমন - মহিলাদের বাছাইনীতি, মনোনয়ন পদ্ধতি, মহিলা প্রতিনিধির স্বল্পতা, পুরুষ প্রতিনিধির তুলনায় মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে সমন্বয় বা যোগাযোগের অভাব, নিজস্ব রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি কারণে আইন সভা নারী সংশ্লিষ্ট কোন সুসংহত উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে মহিলা প্রার্থীরা যতদিন না সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসবেন ততদিন সংসদে নারীর অংশগ্রহণের গুণগত পরিবর্তন হবে না।[৫০]

জাতীয় সংসদে নারীর স্বল্পতার কারণে মন্ত্রী সভায়ও নারীর অংশগ্রহণ সীমিত আকারে দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বলে বিবেচিত যেমন- সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক, সংস্কৃতি বিষয়ক অর্থাৎ, যেসব মন্ত্রণালয়গুলো মেয়েলি বা ফেমিলিন মন্ত্রণালয় হিসেবে বিবেচিত এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে সাধারণত নারী দেখা যায়। শুধু বাংলাদেশে নয়, নারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যে দূরত্ব বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হয় তা আরো চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করা যায় রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।[৫১] বিশ্বের ইতিহাসে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৮ জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[৫২] নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৯৭ সালের মে মাসে স্থানীয় পর্যায়ে তথা ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নারীদের ৩টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। এরূপ সরাসরি নির্বাচনের বিধান যদিও নারীর ক্ষমতায়নের অনুকূলে গৃহীত একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, কিন্তু বাস্তবে এখনও নারী প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও পুরুষ প্রতিনিধিদের অসহযোগিতার কারণে তাদের ক্ষমতা ও ভূমিকা সঠিকভাবে কার্যকর করতে পারছে না। স্থানীয় সরকার কাঠামোতে বিগত কয়েকটি নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের অবস্থান কিরূপ ছিল তা নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে নারী অংশগ্রহণের হারঃ

সন	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	নারী প্রার্থী	নির্বাচিত নারী চেয়ারম্যান
১৯৭৩	৪,৩৫২	---	১
১৯৭৭	৪,৩৫২	---	৪
১৯৮৪	৪,৪০০	---	৬
১৯৮৮	৪,৪০১	৭৯	১ (১% প্রায়)
১৯৯৩	৪,৪৫০	১১৫	২৪
১৯৯৭	---	---	২০

সূত্রঃ নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ও সৈয়দা রওশন কাদির এর প্রবন্ধ এবং দৈনিক জনকণ্ঠ ১০ মে, ১৯৯৮।

আধুনিককালে সরকারের নীতি নির্ধারণী বিষয়টি প্রশাসনের সাথে জড়িত এবং এই প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে নারীর সংখ্যাও অত্যন্ত কম। বাংলাদেশ সচিবালয় এ সংক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

নীতিমালা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সেখানেও নারীর উপস্থিতি একেবারেই গৌণ যা নিচের সারণীর দিকে দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট হয়ে হয়ে উঠবে:[৫৩]

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারী

পদ	পুরুষ	নারী	মোট	%
সচিব	৫৩	১	৫৪	১.৯%
অতিরিক্ত সচিব	৫৯	১	৬০	১.৭%
যুগ্ম সচিব	২৫৭	৫	২৬২	১.৯%
উপ সচিব	৬৫৮	৮	৬৬৬	১.২%
মোট	**১০২৭**	**১৫**	**১০৪২**	**১.৪৪%**

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় যে, উপ সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত মোট ১০৪২ জন কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১৫ জন অর্থ্যাৎ ১.৪৪% নারী। আর এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বাংলাদেশে সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০,৯৭,৩৩৪ এর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৮৩,১৩৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৭.৬ ভাগ।[৫৪]

তবে ইতিবাচক দিক হচ্ছে যে, বর্তমানে হাইকোর্টে মহিলা বিচারপতি নিয়োগ হচ্ছে, পুলিশ, বিমানবাহিনী, সেনাবাহিনী ইত্যাদিতে মহিলাদের সরাসরি অফিসার পদে নিয়োগ এবং এদের বিভিন্ন উচ্চ পদে মহিলারা আসীন হচ্ছে। এমনকি তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীতে ন্যূনতম একজন মহিলা উপদেষ্টা থাকছেন যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের পদে নিয়োগলাভ করেছিলেন একজন নারী যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগলাভ করেন এবং বর্তমানেও কর্মরত আছেন। ফলে একজন নারী যিনি কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মতামত প্রদান করতে পারবেন যা নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের উচ্চ পর্যায়ে মহিলার সংখ্যা বেশী না থাকলেও বাংলাদেশে বহু এনজিও এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বেশী এবং এসব প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি মহিলারাই নিয়ে থাকেন।[৫৫] মোট কথা নারীদের উপযুক্ত দায়িত্ব অর্পণ এবং সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ প্রদান করা হলে তারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন এটা আজ অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট।

২.৪ নারী উন্নয়নের গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। এই প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের নারীর জীবনে কাজের বোঝা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে নারীকে একদিকে যেমন তাদের সংসার ও পুনঃ উৎপাদনমূলক কাজ (যেমন-সন্তান জন্মদান, লালন পালন, রান্না-বান্না, বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন, শাক-সবজির আবাদ) চালিয়ে যেতে হচ্ছে, তেমনি এখন তারা আয়-উপার্জনমূলক কাজ করতেও বাধ্য হচ্ছে।[৫৬] নারীর কাজের বোঝা দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের দারিদ্র সীমা দ্বারা নিরূপিত শ্রম শক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ৭৬.২ শতাংশ পুরুষের তুলনায় ৮৭.৬ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি দরিদ্র পরিবারভুক্ত।[৫৭]

উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তা নিয়ে আলোচনা করার প্রাক্কালে বলা যায় যে, বাংলাদেশের নারীর অদৃশ্য কাজ পুরোপুরি অবহেলিত। তবে প্রত্যাশার কথা হলো যে নারীকে বর্তমানে অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে এবং অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদেশের নারীর কর্মসংস্থানের তথ্যে সুস্পষ্ট লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন বিরাজমান যদিও গত দু'দশকে স্বীকৃত দৃশ্যমান বা দৃষ্টিগ্রাহ্য ও অর্থনৈতিক কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। অর্থাৎ, পেশাজীবি ও মজুরী শ্রমিক হিসেবে নারী দৃশ্যমান হচ্ছে তথাপি বিপুল সংখ্যক নারী শ্রমশক্তি এখনো অবমূল্যায়িত।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর কর্ম সময় পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী। পুরুষের কাজের নির্দিষ্টতা আছে, পুরুষ বাইরের কাজ করে এবং পুরুষের কাজের মূল্য আছে, আছে অবসর, নারীর বেলায় তা নেই। অথচ নারীর কর্মকান্ডের সময় দু'ভাবে ব্যয়িত হয়- (১) গৃহকেন্দ্রিক কর্মকান্ড - শিশু পরিচর্যা এর আওতাভুক্ত যা উৎপাদনশীল কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচিত হয় না এবং এর জন্যে কোন অফিসিয়াল রেকর্ডও নেই, (২) সরাসরি উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক আয়ের সাথে জড়িত কর্মকান্ডে ব্যয়িত সময়।[৫৯]

বাংলাদেশের গ্রামীণ নারী বর্তমানে গৃহকর্মের পাশাপাশি কৃষি কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। তথাপিও এদের কর্মের মূল্যায়ন হয় না। নারীর কৃষিকর্মে অংশগ্রহণকে খুব কমই হিসাবের মধ্যে আনা হয় যদিও কৃষি শ্রমশক্তিতে সম্পৃক্ততায় নারীর অংশগ্রহণ ৫৪.৪%, প্রাথমিক ও অতিরিক্ত বা অন্যান্য পেশায় নারীর সম্পৃক্ততা ২১.০%।[৬০]

বাংলাদেশ যে শিল্পের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে সেটি হলো গার্মেন্টস শিল্প। গার্মেন্টস শিল্প ছাড়াও অন্যান্য শিল্পেও নারী শ্রমিক দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, শহরায়ন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি এবং কৃষি ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারীর কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি কারণে ভুমিহীন এবং নিম্ন আয় সম্পন্ন পরিবারের ব্যাপক সংখ্যক নারীর শিল্পে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে অংশগ্রহণ ইদানিংকালে বেশ লক্ষ্যণীয়।[৬১] গার্মেন্টস শিল্পে অধিক সংখ্যক নারী শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের তুলনায় কম মজুরী পায় এবং পুরুষের তুলনায় নারীকে অতি সহজেই কর্মচ্যুত করা যায়। তাছাড়া, গার্মেন্টস বা কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেলে নারী শ্রমিক পুরুষ শ্রমিকদের মতো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে না। তাই বলা যায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী যেভাবে অংশগ্রহণ করছে তার যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করে নারীর প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নারী মূলধারার বাইরে এসে আর এক ধরনের কাজের সাথে জড়িত সেটি হলো পতিতাবৃত্তি। এ পেশার মাধ্যমে কিছুসংখ্যক নারী দেহ বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে। এ পেশা যদিও সামাজিক দৃষ্টিতে ঘৃণিত কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে তা আবার স্বীকৃত। তাই বলা যেতে পারে সামাজিকভাবে ঘৃণিত হলেও এ পেশায় যাতে কোন মেয়েকে না আসতে হয় সেজন্যে রাষ্ট্র ও সমাজ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বরং পতিতাবৃত্তি টিকিয়ে রাখবার যাবতীয় ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখে পতিতাদের ঘৃণা করার পাত্রীতে পরিণত করেছে।[৬২] ফলে নারীর অসহায়ত্বকে সমাজ যেমন নেতিবাচক স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে ঠিক তেমনটি নারীর ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে ও তার যথাযথ স্বীকৃতিদানের প্রচেষ্টা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে পরিলক্ষিত হয় না। এটা একদিকে যেমন অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তেমনি আবার দেশের সার্বিক উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশের পরিপন্থী। পেশাগত দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যায় যে, আজকের নারী বিভিন্ন পেশায় জড়িত যেমন-সামরিক বাহিনী, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, মডেলিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। এভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর শ্রমশক্তির প্রকৃত মূল্যায়ন ও শ্রমশক্তিতে তার আরো দৃঢ় অংশগ্রহণ শুধু বাঞ্ছণীয়ই নয় বরং অপরিহার্য।[৬৩] তাই বলা যায় যে, দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিতে হবে। সেইসাথে মনে রাখতে হবে নারীকে কেবল উন্নয়নের ফলভোগী বা গ্রহীতা হয়ে থাকলেই চলবে না। বরং তাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীও হতে হবে। আর এটা সম্ভব হলেই নারীর প্রকৃত উন্নয়নের মাধ্যমে তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করে নারীর ক্ষমতায়ন যেমন সম্ভব হবে তেমনি দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী এক অপরিহার্য শক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১। A. N. M. Shamsul Haq, *Subnational Administration in Bangladesh and its Role in Development: An Overview*, Department of Political Science, University of Rajshahi, 1982, p.-10. আরো দেখুন - মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, 'উন্নয়ন তত্ত্ব: বিবর্তন ও বিতর্ক', আব্দুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত *একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ-সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ ৪১।

২। মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, উন্নয়ন তত্ত্ব: বিবর্তন ও বিতর্ক, আব্দুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত *একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ-সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃ ৪১-৪২।

৩। United Nations, *International Development Strategy*, New York: United Nations, 1971, p.5.

৪। Michael P. Todaro, *Economics for a Developing World* (London : Longman Group Ltd., 1997), p. 96.

৫। Lucian Pye, *Aspects of Political Development : An Analytical Study* (New Delhi; Amerind), pp. 45-48.

৬। Edward W. Weidner, *Development Administration in Asia, The Elements of Development Administration,* Durham, N.C.: Duke University Press, 1970, p.8.

৭। মোঃ জালাল উদ্দিন ও সাদেক, "সামাজিক উন্নয়নঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা", আব্দুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত *একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ-সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ ১৩১।

৮। মোঃ রফিকুল ইসলাম "উন্নয়ন সূচক" - আব্দুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত *একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ-সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ ১১০।

৯। জালাল উদ্দিন ও সাদেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৭।

১০। এম. এ. মান্নান, *অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা*, রয়েল ইউনিভার্সিটি সিরিজ, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ ১-২।

১১। *প্রাগুক্ত*, পৃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

১২। *প্রাগুক্ত*, পৃ ২।

১৩। এমাজউদ্দিন আহমদ এবং দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আমলাতন্ত্র, আব্দুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত *একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ-সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ ৪০৯।

১৪। Seers, Dudley, The Meaning of Development, *International Development Review*, xi (14) 1972

১৫। *Fighting Human Poverty, Bangladesh Human Development Report - 2000,* BIDS. Dhaka, Bangladesh, p.19.

১৬। Samuel P. Huntington, *Political Development and Political Decay* in Welch (ed.), p. 215.

১৭। মোঃ আব্দুল মান্নান, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন", আব্দুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত *একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ-সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ ২৬০।

১৮। A. F. K. Organski, *The Stages of Political Development* (New York: Knopf. 1956), pp. 3-17.

১৯। Seymour M. Lipset, "Some Social Requisites of Democracy", *American Political Science Review,* 53 (March-1959), 69-105.

২০। Philips Cutright, *National Political Development*, in Nelson W. Polsby et, al, of Politics and Social Life (Boston: Houghton Mifflin, 1963), p. 571.

২১। মোঃ রফিকুল ইসলাম, উন্নয়ন সূচক, আব্দুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত *একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ-সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ ১১০।

২২। জাহির রাজা চৌধুরী, আমলাতন্ত্র ও উন্নয়ন, *নৃবিজ্ঞান পর্যালোচনা*, সংখ্যা-৩, সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ ২১।

২৩। শাহীন রহমান, নারী উন্নয়ন নীতিমালা, *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৬ষ্ঠ বর্ষ, সংখ্যা- ২০, এপ্রিল-জুন ২০০০, পৃ ২১।

২৪। Sayeda Rowshan Qadir, *Women Leaders in Development Organizations and Institutions,* Palok Publishers, p.-20.

Dhaka University Institutional Repository

২৫। শাহীন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২।

২৬। শাহীন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৪।

২৭। মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম এবং হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, পৃ ১৮১।

২৮। Rounaq Jahan, *The Elusive Agenda: Main-Streaming Women in Development,* Dhaka,University Press Ltd., p.14.

২৯। এস. এম. নুরুল আলম, উন্নয়ন থেকে উত্তর উন্নয়ন: প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা, *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা- ৭১, ১৯৯৯, পৃ ৩০

৩০। জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD): কতিপয় ধারণাগত দিক, *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা- ১০, ১৯৯৭, পৃ ৪১।

৩১। *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪২।

৩২। খুরশীদ আলম, *জনগণও হতে পারে উন্নয়নের রূপকার*, ঢাকা, পৃ ১৮।

৩৩। জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD): কতিপয় ধারণাগত দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৫।

৩৪। *নারী ও উন্নয়ন: প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান*, উইমেন ফর উইমেন, মার্চ ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ ১৭৫।

৩৫। আবিদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশ্লেষণ, *ক্ষমতায়ন*, ১৯৯৮, সংখ্যা-২, পৃ ৫৩।

৩৬। উন্নয়নে কেন জেন্ডার ইস্যু, *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা-৮, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭, পৃ ৪৫।

৩৭। আবিদা সুলতানা, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৩।

৩৮। শাহীন রহমান, মানুষের উন্নয়ন, *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা- ৮, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭, পৃ ২১।

৩৯। জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD): কতিপয় ধারণাগত দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪১।

৪০। উন্নয়নে কেন জেন্ডার ইস্যু, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৬।

৪১। জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD): কতিপয় ধারণাগত দিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪১।

৪২। *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৭।

৪৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪২।

৪৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৮।

৪৫। খালেদা সালাহউদ্দীন, বাংলাদেশে নারী ও কাজ, *উন্নয়ন বিতর্ক*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ ৭।

৪৬। আবেদা সুলতানা, ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীঃ বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান, *ক্ষমতায়ন*, ২০০০, সংখ্যা-৩, উইমেন ফর উইমেন,পৃ ১-২।

৪৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪।

৪৮। Salma Khan, *The Fifty Percent Women in Development and Policy in Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, p.22.

৪৯। তাহ্মিনা আখতার, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ৩৩।

৫০। সালমা আহমেদ, *গভর্ন্যান্স ও নারী, বাংলাদেশের নারী ঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন*, প্রচ্ছদ সম্পাদনায় আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ ২০৪। আরো দেখুন, Hasanuzzaman, Al-Masud and Hussain Naseem A, Women in Legislature in Bangladesh, *Asian Studies,* A Journal of Department of Government and Politics, No. 17, June, 1994, pp.-82-85.

৫১। তাহমিনা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৩।

৫২। United Nations: " *Women Challenges for the year 2000*", New York, 1991, p. - 32.

৫৩। আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ, *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা-২, ১৯৯৮, উইমেন ফর উইমেন, পৃ ৫৭।

৫৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫। নাজমা চৌধুরী ও হামিদা আক্তার বেগম, *নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান,* উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫, পৃ ১২৯।

৫৬। উন্নয়নে কেন জেন্ডার ইস্যু, *প্রাগুক্ত,* পৃ ৪৬।

৫৭। বাংলাদেশের নারী "সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি (১৯৯৫)" *জাতীয় রিপোর্ট,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৫৮। *বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,* আল মাসুদ হাসান উজ্জামান সম্পাদিত ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ ৪৭।

৫৯। তাহ্মিনা আখতার, *প্রাগুক্ত,* পৃ ১৫।

৬০। *নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান,* ঢাকা, বাংলাদেশ, উইমেন ফর উইমেন, পৃ ৮৩।

৬১। Salma Khan, *Op. Cit.,* p. 62.

৬২। *বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,* আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ ৪৯-৫০।

৬৩। *নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, প্রাগুক্ত,* পৃ ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের ধারা

নারী উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন কখনই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কেননা মোট শ্রমশক্তির অর্ধেককে উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে দূরে রেখে কিংবা তাদেরকে প্রত্যাশিত উপায়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত করতে না পারলে উন্নয়নও প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে না। পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারী যা মোট শ্রমশক্তির ৪৮ ভাগ এবং জাতীয় আয়ে প্রায় ৩০ ভাগ অবদান নারীর; যদিও প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭% গণনা করা হয়।[১] তাই এটা বলা যায় যে, নারীর উৎপাদনশীলতার যদি পুরোটা এবং গৃহস্থালীর কাজকে যদি অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় তবে জাতীয় আয়ে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে বেশি ছাড়া কম হবে না। অথচ জাতীয় উন্নয়ন নীতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, নারী এখনও উন্নয়ন পরিকল্পনায় যথোপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। কেননা পরিকল্পনাবিদরা এখনও নারী উন্নয়নের গুরুত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করে জাতীয় উন্নয়ন ইস্যুতে তার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হননি। প্রায় একই চিত্র এশিয়ার অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। মাত্র গুটি কয়েক দেশ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর মূল্যায়ন এবং তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী বিষয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ নিতে পেরেছে। বিশ্ব জুড়ে নারী উন্নয়নের ধারা প্রায় একই রকম, প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী হলেও শতকরা মাত্র ৭/৮ ভাগ নারী পুরুষের সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং বাকীরা প্রাপ্য অবস্থান থেকে অনেক নীচে।[২] সুশীল সমাজসহ সমাজের সচেতন মহলের উদ্দ্যোগ ও সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্দ্যোগের ফলে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি বাংলাদেশেও নারী উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে। নারী উন্নয়নে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

৩.১ সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হলো:

৩.১.১ বিভিন্ন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী

স্বাধীনতার পর যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ স্বীকৃত হবার চেষ্টা বীরাঙ্গনা মেয়েদের এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ মেয়েদের পুনর্বাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর ধরন ছিল সমাজকল্যাণ ও পুনর্বাসনের।[৩] ১৯৭৩-৭৮ সালের জন্য প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকার প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং মহিলাদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন পৃথক বাজেট বরাদ্ধ করা হয়নি।[৪] এই পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) একটি কল্যাণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল এবং যুদ্ধাক্রান্ত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল।[৫] ফলে এ সময় যে সব কর্মসূচী নেয়া হয় তার মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধসহ বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে যে সব নারী বিধবা বা নিগৃহীত হয়েছে তাদের পুনর্বাসন। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলাকালীন সময়েই ১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের অধীনে মহিলা-বিষয়ক

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ নামে একটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করে তার অধীনে মহিলাদের কল্যাণে জাতীয় মহিলা একাডেমী, মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকায় মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। তবে এই পরিকল্পনার মেয়াদকালীন সময়ে উপরিউক্ত প্রকল্পের একটিও বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর ১৯৭৮-৮০ এই দু'বছরের জন্য প্রণীত দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার প্রদান করে মহিলাদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কৃষিভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী, কুটির শিল্প স্থাপন, উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং কর্মজীবি মহিলা ও তাদের শিশুদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৬] দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথমবারের মতো মহিলা উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় যার পরিমাণ ছিল ১০.৫৬ কোটি টাকা।[৭] ১৯৭৮ সালের নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বর্ধিতকরণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল।[৮] এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ঋণের ব্যবস্থা করে উপার্জনক্ষম কাজে অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করা, মহিলা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রথম নারী জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়। এই সময়কালেই অর্থাৎ, ১৯৮২ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে একীভূত করা হয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। নারী ও পুরুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বৈষম্য হ্রাস করা এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যটি তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) স্থান পায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ:[৯]

Dhaka University Institutional Repository

ক) অর্থকরী কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান অসম সম্পর্ক দূর করা;

খ) শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করা;

গ) নারীর স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

ঘ) কর্মজীবি মহিলাদের জন্য হোস্টেল এবং তাদের বাচ্চাদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করা;

ঙ) বিভিন্ন পর্যায়ে মেয়েদের নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ দেওয়া;

চ) শিশুদের জন্য নৈতিক, শারীরিক, এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা; এবং

ছ) সামাজিকভাবে উপেক্ষিত এবং প্রতিবন্ধী মহিলাদের পুনর্বাসন করা।

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, এই পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচীর দিক নির্দেশনা ও সমন্বয়ের জন্য সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে নিছক সমাজ কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে না দেখে জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল ধারায় পরিচালিত করার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের জন্য আলাদা একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়। এই দর্শনকে সামনে রেখে জাতীয় পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয় তা হলো:

Dhaka University Institutional Repository

ক) বহু-খাতমুখী প্রচেষ্টাসহ নারীকে একটি সামষ্টিক কাঠামোয় স্থান দিয়ে নারী সংক্রান্ত বিষয়সমূহ যথাযথ বিবেচনাপূর্বক দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীর উন্নয়নের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেয়া;

খ) জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ বা হ্রাসের লক্ষ্যে নারীর স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণ; ঋণের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা; এবং

গ) ঘোষিত লক্ষ্য ও নীতিমালা সমূহের সফল বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক নজরদারী জোরদার করা।

উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর জন্য কৃষি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্য, সরকারী পরিসেবা এবং সামাজিক খাতে সম্পদ বরাদ্ধ রাখা হয়। পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৫-২০০০) জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প সমূহ এমনভাবে গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় যাতে পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে টেকসই ও গণমুখী উন্নয়ন সম্ভব হয়। কেননা এটা আজ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী যাদের বাদ দিয়ে কোন যৌক্তিক ও অর্থবহ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য সরকারী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নারীর বিদ্যমান শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতার স্থায়ী বৃদ্ধিসাধন এবং শ্রমশক্তির অঙ্গনে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নারীর দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো যাতে একটি যৌক্তিক প্রবৃদ্ধির হার অর্জন, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ, স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের দ্বারা বিশেষত অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা এবং স্ব-নির্ভরতার মাত্রা বৃদ্ধি করা।[১০] আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের উপর যেমন- আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সমূহের বাস্তবায়ন, আইন সংস্কার এবং আইন কার্যকর করা,

প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ, সচেতনতা সৃষ্টি, সরকারী সম্পদ বরাদ্ধ, এ্যাডভোকেসী, আন্তঃখাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহে নারী উন্নয়নে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

নারী উন্নয়নের সরকারী ব্যয়ের চালচিত্র :[১১]

(কোটি টাকায়)

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)	দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)	২য় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	৩য় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০	৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)	৫ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০০০)
নারী সেক্টরের জন্য পৃথক কোন বরাদ্দ ছিল না	১০.৫৬	৩১.০০	৫০.০০	৫৫.০০	৩৩৫.৮০ (ভিজিডি কর্মসূচী ৫৯.৮০ কোটি টাকাসহ)

নারী উন্নয়নের জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে তেমনি এখাতে সরকারের বরাদ্দের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এ বর্ধিত বরাদ্দও পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া বরাদ্দকৃত অর্থও কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে গৃহীত কর্মসূচীর সফলতা।

৩.১.২ বাংলাদেশের সংবিধানে নারী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারী অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন-সংবিধানের ১০ ধারায় বলা হয়েছে, "

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।" ২৭ ধারায় বলা হয়েছে "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" ২৮(১) ধারায় বলা হয়েছে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।" ২৮(২) ধারায় উল্লেখ আছে "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।" ২৮(৩) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা বিশ্রামের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিকের কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।" ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।" ২৯(১)-এ রয়েছে "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।" ২৯(২)-এ বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।"

সংবিধানের উপক্তিউক্ত ধারার আলোকে বলা যায় যে, সাংবিধানিকভাবে তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য রাখা হয়নি; বরং সমান অধিকার স্বীকৃত এবং সংবিধিবদ্ধভাবেই নারী সর্বস্তরে নিজের অবস্থান তৈরির অধিকার সংরক্ষণ করে। নারীর অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও নারীর বাস্তব অবস্থার প্রত্যাশিত পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ, আইন আছে যার বাস্তব প্রয়োগ পরিপূর্ণতা লাভ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৩ বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

স্বাধীনতার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত এবং বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পঞ্চ-বার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায়ও নারীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতার পর যে সব নারী স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রেখেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সে সব নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে গঠন করা হয় বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড। এ সময় ১৯টি জেলা এবং ২৭টি মহকুমাসহ মোট ৬৪টি কেন্দ্রের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয়। নারী পুনর্বাসন বোর্ডের কর্ম পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালে বোর্ড পুনর্গঠিত করে সংসদীয় এ্যাক্ট এর মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয় যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল - (ক) নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা; (খ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করা; (গ) নারীকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা; (ঘ) উৎপাদনমুখী ও প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীর জন্য দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা; (ঙ) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এবং তাদের সন্তানদের জন্য বৃত্তি প্রথা চালুর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

১৯৭৬ সালে গঠন করা হয় জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিতকরণ এবং নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন করা হয় ১৯৮৪ সালে যা ১৯৯০ সালে উন্নীত হয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে। ১৯৯৪ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে শিশু সংক্রান্ত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্রমে ক্রমে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৯৪ সালের ৫ মার্চ থেকে শিশু বিষয়ক, ১৯৯৫ সালে বেইজিং কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৯৬ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী এই মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ০৮ মার্চ আন্তজার্তিক নারী দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। নারী উন্নয়নের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। এই কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করে নিজ নিজ নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন করছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে 'বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন' বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। জেন্ডারকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর বিভিন্ন নীতিমালা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আইনগত সহায়তা, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, সচেতনতা বৃদ্ধি ও ওকালতীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে এই মন্ত্রণালয় আরো যেসব দায়িত্ব পালন করছে তা হলো - (ক) নারীদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ; (খ) নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত সিডো সনদ বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রেরণ; (গ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার বিষয়াদি তদারকি; (ঘ) শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘে প্রতিবেদন প্রেরণ; (ঙ) জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং (চ) বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

বর্তমানে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৬৪টি জেলার ৩৯৬টি উপজেলায় এবং জাতীয় মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ৫০টি থানায় কাজ করে যাচ্ছে যার মূল লক্ষ্য হলো জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা করা। এজন্য নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থার নারী ও শিশু নির্যাতন সেল এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সরকার সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীতেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

৩.১.৪ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। সত্তর দশকের শুরু থেকে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি জাতিসংঘের নীতিতে বিশেষভাবে গৃহীত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালকে জাতিসংঘ "বিশ্ব নারী বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করে এবং (১৯৭৫-৮৫) এই দশককে নারী দশক হিসেবে পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রক্রিয়া। জাতিসংঘ আয়োজিত ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন থেকে শুরু করে কোপেনহেগেন ও নাইরোবী সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত বেইজিং সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশও অংশগ্রহণ করে। সবশেষে অনুষ্ঠিত বেইজিং সম্মেলনে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন' গৃহীত হয় যাতে বাংলাদেশও অনুস্বাক্ষর করে। বেইজিং এ অনুষ্ঠিত "প্লাটফরম কর এ্যাকশন" বাস্তবায়নের জন্য "টাস্কফোর্স" ও "Core Group" গঠন করা হয়। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত "জনসংখ্যা উন্নয়ন ও কর্মপরিকল্পনা" এবং ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সালে কোপেনহেগেন এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ এসকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় অনুস্বাক্ষর এবং এগুলো বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করছে।

এছাড়াও নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" (সিডও) গৃহীত হয়। এই কনভেনশন বা সিডও দলিলের মর্মবাণী হল সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে তার যথাযথ স্বীকৃতি এবং সার্বিকভাবে বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা স্থাপন করা।[১২] ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সনদের ২, ১৩(ক), ১৬(১) (গ) ও ১৬(১) (চ) সংরক্ষণসহ এ সনদে অনুস্বাক্ষর করে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ দু'টি অনুচ্ছেদ নং (১৩) (ক) এবং ১৬(১) (চ) এর উপর থেকে তার সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে।

৩.২ আন্তর্জাতিক বিশ্বে নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচী

নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় হলো:

৩.২.১ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও নারী উন্নয়ন

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ থেকে অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বিশ্ববাসীর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পৃথিবীর সব মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত নাগরিক জীবন এবং স্বাতন্ত্র ব্যক্তি সত্ত্বা। নারী বাস্তবে এই ব্যক্তি স্বাধীনতা সমানভাবে ভোগ করতে পারে না। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, ১৯০২ সালে গৃহীত "হেগ কনভেনশন" - ই প্রথম আন্তর্জাতিক দলিল যাতে নারী অধিকারকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়ে আসছে জাতিসংঘের অন্যতম অংগ সংস্থা অর্থনৈতিকও সামাজিক পরিষদে। এ পরিষদের অধীনে ১৯৪৬ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত "নারীর মর্যাদা কমিশন" (Commission on the Status of Women)। এর প্রধান উদ্দেশ্যে হলো- Prepare recommendations and reports to the economic and social council on Promoting women's rights in Political economic, Civil, Social and educational fields and to make recommendations on urgent problems requiring immediate attention in the field of women's rights.[১৩] জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয় মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র, এছাড়া জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সময়ে গৃহীত হয়েছে নানাবিধ দলিল। এই সকল দলিলে নারীর অধিকার বিষয়ক ধারাগুলো অন্তর্ভূক্ত করার জন্য, মেহনতী নারীর অধিকার ও তাদের মানবিক মর্যাদা রক্ষার্থে সর্বোপরি সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছে সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলো।[১৪] জাতিসংঘ বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ বৈষম্যকে তার সদস্য দেশসমূহে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও সদস্য দেশগুলো বাস্তবে এসব পদক্ষেপ নেয়নি। জাতিসংঘের উল্লেখযোগ্য সনদসমূহ হলো- নারীর রাজনৈতিক অধিকার সনদ (১৯৫২), বিবাহিত নারীর নাগরিকত্ব সনদ (১৯৫৭), বিবাহের সম্মতির ন্যূনতম বয়স নির্ধারিণ ও বিবাহ নিবন্ধিকরণ সনদ (১৯৬২), দাসত্ব ও পতিতাবৃত্তি রোধ সনদ (১৯৪৫: কার্যকর

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১), নারী পুরুষের সমান মজুরী সনদ (১৯৫১) ইত্যাদি। উল্লিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীর প্রতি বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের সঠিক রূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের সম্বন্ধে একটি ঘোষণা গৃহীত হয় যাতে - উপরোক্ত সনদগুলোসহ নারীর অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়।[১৫] এসব সনদ প্রয়োগ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ছিল অনুপস্থিত, সে সময় নারীকে দেখা হতো মা ও গৃহবধুরূপে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী ছিল অদৃশ্য। পরবর্তীতে - জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ এবং (১৯৭৬-৮৫) এই দশককে আন্তর্জাতিক নারীদশক হিসেবে ঘোষণা করে দেখায় যে, নারী উন্নয়নের চালিকা শক্তি ও উপকারভোগী উভয়ই। এই সময়েই নারী ইস্যুটি মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে বিবেচিত হয় এবং তা সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়।[১৬]

নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত সনদ সিডও (CEDAW)। যার মূল লক্ষ্য হলো- মানবসমাজ, সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নে যুগ যুগ ধরে নারী সমাজ যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে তার যথাযথ স্বীকৃতি দান ও সকলক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা স্থাপন করা।

৩.২.২ নারী উন্নয়নে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন

বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তথা নারীর অধিকারের পক্ষে জনমত গঠন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেঃ বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তথা নারীর অধিকারের পক্ষে জনমত গঠন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেঃ

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.২.১ প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৭৫), মেক্সিকো

জাতিসংঘ আয়োজিত ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো সিটিতে। এই সম্মেলনে ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক "নারী বর্ষ" এবং (১৯৭৬-৮৫) এই সময়কে আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলনে যোগদান করেন ১৩৩টি দেশের ১২০০ জন প্রতিনিধি যার ৭৩ শতাংশই ছিল নারী প্রতিনিধি। এই সম্মেলনের প্রভাবে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন দাতা সংস্থায় উন্নয়নে নারী বিভাগ (WID Unit) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৮০-এর দশক থেকেই নারী উন্নয়ন তথা নারীর অধিকারের বিষয়টি মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে এবং সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে পরিনত হয়। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল শ্লোগান ছিল - "সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি, এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি" বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা (WOPA) গৃহীত হয়। তবে ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো - প্রতিটি দেশে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণে জাতীয় মেশিনারী প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সংস্থায় নারী ইউনিট গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘের জোর সুপারিশ।[১৭]

৩.২.২.২ দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৮০), কোপেনহেগেন

১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় ২য় বিশ্ব নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনে ১৪৫ টি দেশের ১৫০০ জন সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত "বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং নারী অধিকার সম্পর্কিত সাধারণ কিছু বিষয় নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল - To review the progress in implementing the goals of the mexico city conference at the

midpoint of the United Nations Decade for women and to update the 1975 world plan of Action adopted at the earlier conference.[১৮]

৩.২.২.৩ তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৮৫), নাইরোবী

এই সম্মেলনে ১২০টি দেশের সরকার তাদের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করে। এই সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারী প্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ (NELS) গৃহীত হয়।

৩.২.২.৪ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫)

নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনাকে ভিত্তি করে চীনের রাজধানী বেইজিং শহরে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন এ সম্মেলনে বিগত দু'দশকের অগ্রগতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মূল্যায়ণ করা হয় এবং"বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন" ঘোষণা করা হয়। তাই প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নের জন্য কিছু ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয় এবং এগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে নারীর সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে কিছু বিবেচ্য ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয় যা নিম্নরূপ:

১. নারী ও দারিদ্র ;
২. নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
৩. নারী ও স্বাস্থ্য;
৪. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা;
৫. নারী ও সশস্ত্র সংঘাত;

Dhaka University Institutional Repository

৬. নারী ও অর্থনীতি;

৭. ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী;

৮. নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো;

৯. নারীর মানবাধিকার;

১০. নারী ও পরিবেশ;

১১. নারী ও তথ্য মাধ্যম; এবং

১২. নারী ও মেয়ে শিশু ।[১৯]

এই ১২টি ক্ষেত্রকে বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাহলো:

১. ২০০০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এমন জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্রাস করার লক্ষ্যে নারীর জন্য উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করতে হবে।

২. দরিদ্র নারীর জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. সম্পত্তির আইনগত মালিকানা, ঋণ গ্রহণ ও অন্যান্য সেবার ব্যাপারে নারীকে সমান সুযোগ দিতে হবে।

৪. শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতে হবে।

৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশে বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. পাঠক্রম ও পাঠগ্রন্থ থেকে নারী বিদ্বেষী উপাদান বাদ দিতে হবে।

৭. শিশু-মৃত্যু ও গর্ভধারণ সম্পর্কিত মৃত্যু অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. প্রজনন-সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।

৯. নারীর মধ্যে এইডস ও এইচ আই ভি সংক্রমণ রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. নারী নির্যাতনের মূল উৎস সন্ধান করতে হবে ব্যাপকতর ভিত্তিতে এবং নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এর মূল উৎপাটন করতে হবে।

১১. নারী নির্যাতন বন্ধে আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থার সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২. নারী-পাচার বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩. সমান কাজের জন্য নারী-পুরুষের সমান মজুরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে কোন অপমানজনক আচরণ রোধ করতে হবে।

১৫. নারীর জন্য ঋণদানের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ এবং তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. নারীকে প্রযুক্তি, বাজার ও বাণিজ্যে সমান সুযোগ দিতে হবে।

১৭. নারীর জন্য খন্ডকালীন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. তথ্য ও গণমাধ্যম ক্ষেত্রে নারী যাতে প্রবেশের সমান সুযোগ ও অধিকার পায় তা নিশ্চিত করার জন্য যথযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৯. গণমাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নারীর সংকীর্ণ ভাবমূর্তি (Image) দূর করতে হবে।

২০. টেকসই উন্নয়ন ও বজায় রাখার মত ভোগের ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে সুনিশ্চিত করতে হবে।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.২.৫ বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলন (২০০০)

২০০০ সালে জাতিসংঘের সদরদফতর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলন, এ সম্মেলনে বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন ঘোষণার বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে গত ৫ বছরে তাদের সফলতাও ব্যর্থতা এবং বাঁধা ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, আজ আগের তুলনায় বিশ্বের অনেক বেশী সংখ্যক দেশ এ কথা উপলব্ধি করতে পারছে যে, সমাজে নারী পুরুষের সমতা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কেননা পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর অর্ধেককে উন্নয়ন ধারার বাইরে রেখে মানব সমাজের উন্নয়ন বা অগ্রগতি সম্ভব নয়।[২১] এই সম্মেলনে ২০০৫ সালের মধ্যে নারী উন্নয়নের জন্য বেইজিং ঘোষণা বাস্তবায়নের তৎপরতা জোরদার করার অঙ্গীকার করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নারী উন্নয়ন এবং নারীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যে সব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এসব সম্মেলন থেকে যেসব অঙ্গীকার বা ঘোষণাপত্র নির্ধারণ করা হয়েছে সেসব ঘোষণাপত্রের অধিকাংশই তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশও স্বাক্ষর করেছে ও গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় যে, বাংলাদেশ এসব ঘোষণার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে এবং এমনভাবে নীতি-নির্ধারণ ও কর্মসূচী গ্রহণ করবে যাতে নারী উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দ্রুত অপসারিত করে নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিত করতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.২.৫ নারী উন্নয়নে অনুষ্ঠিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন

নারী উন্নয়নের জন্য ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু শীর্ষ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর মেয়ে শিশু আর যেন অবহেলা এবং নির্যাতনের পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেন না বেড়ে ওঠে। এ সম্মেলনে সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রণীত ১৯৮৯ সনের জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুমোদনের জন্য বিশ্বের ১৭৯টি দেশ স্বাক্ষর করে। এ সম্মেলনে (১৯৯১-২০০০) সালকে ঘোষণা করা হয় "কন্যাশিশু দশক" হিসেবে। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এ সম্মেলনে গৃহীত দলিলগুলো হলোঃ

1. Agenda 21.
2. The Rio Declaration on Environment and Development.
3. The Statement of Forest Principles.
4. The United Nations Framework convention on climate change; and
5. The United Nations convention on Biological Diversity.[২২]

এরপর ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন। নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকে জাতিসংঘের সার্বিক মানবাধিকার কর্মসূচী ও কর্মকান্ডের সংগে একীভূত করাই হচ্ছে এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। সামাজিক পরিষদ ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কায়রোতে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা উন্নয়ন সম্মেলন আহবান করে। এ সম্মেলনে জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্থায়ী উন্নয়নের মধ্যেকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক পরীক্ষা করে দেখা হয়। এ সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমবারের মতো উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২৩] এছাড়া ১৯৯৫ সালের (৬-১২) মার্চ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনে একটি খসড়া কর্মসূচী রয়েছে এবং এই কর্মসূচীতে দারিদ্র, বেকার ও সামাজিক দুর্দশার উৎস কমিয়ে আনা এবং তা নির্মূল করার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের উল্লেখ রয়েছে। এ সম্মেলনে নারীর অধিকারের বিষয়ে বলা হয় "নারী ও পুরুষের মধ্যে পুরোপুরি সমতা অর্জন এবং সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ স্বীকার এবং তা বৃদ্ধি করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী, *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, সংখ্যা- ৬, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬,পৃ ১০৭।

২। কনক সরওয়ার, নারীর অগ্রযাত্রা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, নভেম্বর ৯, ২০০১, পৃ ১৩।

৩। নারী ও উন্নয়ন: প্রবণতা, দর্শন ও প্রয়োগ, *প্রথম কর্মশালা, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা*, পৃ ১৫।

৪। তাহমিনা আখতার, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, পৃ ৩৮।

৫। আজাদুর রহমান চন্দন, পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নারী, *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা- ১৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ ৮।

৬। তাহমিনা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৮।

৭। *Govt. of Bangladesh, Second Five Year Plan,* Planning Commission, 1980-85, p. 435.

৮। তাহমিনা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৯।

৯। নারী ও উন্নয়ন: প্রবণতা, দর্শন ও প্রয়োগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬।

১০। আজাদুর রহমান চন্দন, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮।

১১। *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৫ম বর্ষ, সংখ্যা- ১৮, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ ১৮।

১২। *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ*, জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), জাতিসংঘ, পৃ 4।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। *The United Nations and the Advancement of Women (1945-1995),* United Nations, Blue Books Services, New York, p. 13.

১৪। মালেকা বেগম, নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ, *সমাজ নিরীক্ষণ,* সংখ্যা-২২, পৃ ৮৬।

১৫। সালমা খান, *সিডও এবং বাংলাদেশ,* স্টেপস্ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, মার্চ ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ ৬।

১৬। শাহীন রহমান, নারী উন্নয়ন নীতিমালাঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত, *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা- ১৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ ৫৩।

১৭। *প্রাগুক্ত,* পৃ ৫৩।

১৮। *The United Nations and the Advancement of Women (1945-1995), Op. Cit,* p.- 43.

১৯। *জাতিসংঘ, ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনঃ ঘোষণাও কর্মপরিকল্পনা,* মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ ৫।

২০। সৈয়দ মোহাম্মদ মাহেদ সৈয়দ আবদুল করিম ও মুহম্মদ সামাদ, *মানবাধিকারঃ ৫০ বছরের অগ্রযাত্রা,* বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, পৃ ১৭১-১৭২।

২১। *দৈনিক জনকণ্ঠ,* ১১ জুলাই, ২০০০।

২২। *জাতিসংঘ সংবাদ,* ৯ম বর্ষ, সংখ্যা- ৪ ও ৫, এপ্রিল-মে ১৯৯৭, পৃ ২।

২৩। জাতিসংঘ এবং নারী উন্নয়ন, *উন্নয়ন পদক্ষেপ,* ৩য় বর্ষ, সংখ্যা- ৮, এপ্রিল-জুন ১৯৯৭, পৃ ১৪।

২৪। *জাতিসংঘ সংবাদ,* ৭ম বর্ষ, সংখ্যা- ১, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে এনজিও'র ভূমিকা

বাংলাদেশে এনজিও'র কার্যক্রম মূলত শুরু হয় ৭০ দশকের শুরুতে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে। এরপর ক্রমেই তাদের কার্যক্রমে প্রসারতা লাভ করতে থাকে। ফলে এনজিওদের সাংগঠনিক চরিত্র ও কাঠামোতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে এনজিওগুলো সরকারী কর্মসূচীর পাশাপাশি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা, মৎস্য ও পশুপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রাম বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এক কথায় এরা সরকারী বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সহায়ক ও বিকল্প শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশেষ করে গত দু'দশক ধরে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে নারী উন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ, নারীর স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশের এনজিও। সেই সাথে এনজিওদের এসব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে আবার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেক এনজিও আবার এসব কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে এনজিওদের চিহ্নিত করা হলেও বর্তমানে কিছু এনজিওর বিতর্কিত ভূমিকার কারণে তাদের কর্মকান্ড আবার বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। সুতরাং, বাংলাদেশের

এনজিও'র ভূমিকা কী বা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও কতটা অবদান রাখছে তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এসব দিক সমূহ তুলে ধরা হলো:

৪.১ বাংলাদেশে এনজিও কর্মকান্ডের বর্ণনা

তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্রক্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এনজিও'র অংশগ্রহণের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। তেমনি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে যদিও স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতার পর পর এদের কার্যক্রম ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণ তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও'র কর্মকান্ড অত্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষ করে শিক্ষা, কৃষি, দারিদ্র দূরীকরণমূলক বিভিন্ন আয়-উপার্জনকারী কর্মসূচী, স্বাস্থ্যসেবা, মহামারী প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনজিও'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব এনজিও স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচালিত অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের পাশাপাশি মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন রুলস বা আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ, আবহমানকাল ধরে বিভিন্ন সমাজে আর্তের সেবায় বা মানব কল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মহতী প্রয়াসের প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত রূপই হচ্ছে বর্তমান বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও কার্যক্রম।[১] বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র মানুষের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো বিশেষ করে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা। আর এ লক্ষ্যে এনজিওরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তাদের

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম পরিচালনা করে সমাজে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। এনজিও কার্যক্রম ক্রমে পেশায় উন্নীত হতে থাকে।[২]

বিশ্বের অন্যান্য দরিদ্র দেশের ন্যায় বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে বেসরকারী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২২,০০০ এনজিও রয়েছে এবং এদের উৎপত্তি, আকার, তহবিলের উৎস, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, কাজের পরিমন্ডল ইত্যাদির ভিত্তিতে চারটি প্রধান ভাবে ভাগ করা যায় যা নিম্নরূপ:[৩]

ক) সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন;

খ) জাতীয় সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন;

গ) বৈদেশিক অনুদানে পরিচালিত বাংলাদেশী এনজিও; এবং

ঘ) বিদেশী এনজিও।

যে সব এনজিও অত্যন্ত ক্ষুদ্র আয়তনের এবং সরকারী অনুদান ও স্থানীয় অনুদানের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে তাকে আমরা সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। মার্চ, ১৯৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী এদের সংখ্যা ২১,০০০ হাজারেরও অধিক।[৪] অর্থাৎ, ক্ষুদ্রায়তনের হলেও সংখ্যার দিক দিয়ে এদের সংখ্যাই সর্বাধিক। অন্যদিকে জাতীয় সমাজকল্যাণমূলক এনজিও অনেকটা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অনুরূপ। তবে এরা জাতীয় ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রায় সারা দেশব্যাপী কর্মকান্ড পরিচালনা করে। আর বৈদেশিক অনুদানে পরিচালিত বাংলাদেশী এনজিওদের গণ্য করা হয় উন্নয়নমূলক এনজিও হিসেবে যা বর্তমানে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধনকৃত। জুলাই, ১৯৯৯ এর হিসাব অনুযায়ী এদের

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা ১২২৩।[৫] আর সর্বশেষ শ্রেণী অর্থ্যাৎ বিদেশী এনজিও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধনের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নিজেরাই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। জুলাই, ১৯৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী এদের সংখ্যা ১৪৭।[৬] বাংলাদেশে যে সকল এনজিও কাজ করে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান এনজিও হলো ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, আশা, নিজেরা করি, গণসাহায্য সংস্থা ইত্যাদি। উপরিউক্ত এনজিও কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, এসব এনজিও'র মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। এদের মধ্যে অন্যতম একটি এনজিও হলো ব্র্যাক। ব্র্যাকের কর্যক্রম এখন সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত। অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংক বর্তমানে দেশব্যাপী গ্রামের বিত্তহীন নারীকে ঋণ প্রকল্পের আওতায় এনে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। 'আশা' ও 'নিজেরা করি নারীর সচেতনা বৃদ্ধি ও অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন করে তোলা, মনোবল সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী গ্রহণ করছে। প্রশিকা মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়া গণসাহায্য সংস্থা প্রধানত: গ্রাম সংগঠনের সদস্যদেরকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ উইমেন হেলথ কোয়ালিশন নারীর স্বাস্থ্য বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের পরিচর্যা, রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের শিক্ষা দিয়ে থাকে। বর্তমানে এইসব এনজিও'র কাজের পরিধি ও ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত আশা'সহ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এনজিও'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়ঃ

৪.১.১ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা)

সমাজের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জন্য কাংখিত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৮ সালে 'আশা' গঠনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি এনজিও হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপ্রকাশ করে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নিবন্ধন লাভের মাধ্যমে। প্রাথমিক অবস্থায় সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি বা সহায়তা করার লক্ষ্য নিয়ে আশার কার্যক্রম স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে শুরু হলেও কালক্রমে প্রতিষ্ঠানটির ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমান পর্যায় এসে পৌঁছেছে। 'আশা'র কর্মকান্ড, কৌশল ও তার বাস্তবায়নে যে পরিবর্তন সেটাকে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায়:[৭]

ক) প্রতিষ্ঠা কাল (১৯৭৮-১৯৮৪)ঃ এ সময় ভূমিহীনদের প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত ৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা 'আশা' পরিচালিত হতো। তখন 'আশা'র মূল কর্মকান্ড ছিল ভূমিহীন এবং দরিদ্রদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সংগঠিত করা। এ লক্ষ্যে আশার গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন আইনী সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং পল্লী এলাকার সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

খ) অর্ন্তবর্তীকাল (১৯৮৫-১৯৯১)ঃ ১৯৮৫-১৯৯১ সালকে 'আশা'র ট্রানজিশন কাল বলা হয়। কেননা এই সময়কালে আশা'র কর্মকান্ডে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। 'আশা' কর্তৃক এ সময়ে গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক শিক্ষা, আয় অর্জনের জন্য ঋণদান, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী, স্বাস্থ্যসেবা (যেমন- প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টির উন্নয়ন, প্রথাগত দাইদের প্রশিক্ষণ), মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীর ন্যায় সমন্বিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রবর্তন।

গ) কর্মসূচী বিশেষায়ন কাল ('আশা'র বর্তমান ধাপ)ঃ ১৯৯১ পর থেকে বর্তমান সময়কে 'আশা'র কর্মসূচী বিশেষায়ন কাল বলা হয়। এ সময় বিশেষ করে ১৯৯২ সাল থেকে সংস্থাটি অন্যান্য এনজিও'র ন্যায় ঋণদান কর্মসূচী প্রবর্তন করে যাতে সদস্যরা

স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থান, উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারে। তবে এ ঋণ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ছিল সদস্যদের শিক্ষার উন্নয়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। উল্লেখ্য যে, এ পর্যায়ে 'আশা'র কৌশলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। 'আশা' কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচী এমনভাবে প্রণীত হয় যাতে পুরুষের চেয়ে নারী অগ্রাধিকার পেতে থাকে। ফলে ক্রমে ক্রমে সংস্থাটি পুরুষের পরিবর্তে নারীর সংগঠনে পরিবর্তনে হয়। এভাবে সংগঠনটি কালের বিবর্তনে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জুন, ২০০১ পর্যন্ত সংগঠনটি ৬৪ জেলার ৪১৩টি থানার ৪,৬৫০টি ইউনিয়নের মোট ২৬,২১৮টি গ্রামের ১১,৯৪,৯৬৯ জনের মধ্যে ঋণদান করছে যার মধ্যে ১১,৪০,২৭৫ জনই নারী। উল্লেখ্য যে, এই ঋণের আদায়ের হারও অত্যন্ত সন্তোষজনক, অর্থাৎ ৯৯.৯০%। আশা বর্তমানে ৯৫০টি শাখা অফিসের মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।[৮]

৪.১.২ বাংলাদেশ রুর‍্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)

দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলার জন্য অর্থনৈতিক কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে যে সব এনজিও কার্যক্রম শুরু করে তাদের মধ্যে ব্র্যাক অন্যতম একটি প্রাচীন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এটির কার্যক্রম প্রথম শুরু হয় ১৯৭২ সালে সিলেটের শাল্লা অঞ্চলে যুদ্ধোত্তর জরুরী এবং তাৎক্ষণিক সাহায্য এবং পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে। বর্তমানে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ব্র্যাকের কার্যক্রম বিস্তৃত। ব্র্যাকের কার্যক্রমের তিনটি পর্যায় হলো:[৯] প্রথম পর্যায়ে ত্রাণ তৎপরতা; দ্বিতীয় পর্যায় ছিল গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচী যেমন- কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য উন্নয়ন, গ্রামীণ সমবায়, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা, নারীর বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি; এবং তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ অর্থাৎ গ্রামের গরীবদের জন্য ও তাদের নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

"অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন। বর্তমানে ব্র্যাক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বিশেষ করে নারীর অংশগ্রহণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ব্র্যাক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রযুক্তি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন এর মাধ্যমে দারিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন ব্র্যাকের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে ব্র্যাকের যাবতীয় কর্মকান্ড যে দু'টো মুখ্য উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তা হলো:[১০] (ক) দারিদ্র দূরীকরণ এবং (খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং অধিকার আদায়ে সক্ষম করে তোলা। ব্র্যাক টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ বা অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন এই কৌশলে অধিক বিশ্বাসী। ব্যক্তি তার একক এবং যৌথ প্রচেষ্টায় যে নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে ব্র্যাক কর্তৃক গৃহীত ও অনুসৃত এ শ্লোগান গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। ব্র্যাক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীর পাশাপাশি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী। এ কর্মসূচী গ্রামের দরিদ্র নারী শিক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাক মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে উন্নয়নের পটভূমিতে শিক্ষার ভিত্তি রচনা করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তবে এক্ষেত্রে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্র্যাক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্কুলে নারী শিক্ষকের আধিক্য। ব্র্যাক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষকের ৯০% মহিলা এবং ব্রাকের আওতাভূক্ত গ্রামের ৭০% বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।[১১] এভাবে ব্র্যাক বিভিন্ন উন্নয়ন সহায়ক কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।

৪.১.৩ গ্রামীণ ব্যাংক

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনুস ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী জোবরা গ্রামে একটি গবেষণা প্রকল্প হিসেবে এর কাজ শুরু করেন। পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে এক অধ্যাদেশের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক একটি প্রকল্প হতে ব্যাংক হিসেবে রূপলাভ করে।[১২] গ্রামীণ ব্যাংক এমন একটি ঋণদানকারী সংস্থা যা গ্রামের দরিদ্র ও ভিত্তহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের বাসস্থান, আয় ও ভোগ বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং নারীকে স্বাবলম্বীকরণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তবে এই ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানটির সহিত সমাজের অন্যান্য প্রথাগত (Traditional) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকসমূহের মৌলিক পার্থক্য হলো শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট কিছু জামানতের বিপরীতে ঋণ দিয়ে থাকে। ফলে ভূমিহীন ও সহায় সম্বলহীন দরিদ্র শ্রেণী কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে গ্রামের বিভিন্ন ভূস্বামী ও মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয় যা ঋণগ্রহীতাকে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ায় আরো দ্রুত ঠেলে দেয়। এক্ষেত্রে এসব দরিদ্র শ্রেণীকে কোন জামানত ছাড়াই ঋণদানে প্রথম এগিয়ে আসে গ্রামীণ ব্যাংক। এসব দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীন শ্রেণীর অবদমিত শ্রম শক্তিতে জাগ্রত করে তাদের অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গ্রামীণ ব্যাংকই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাংক, যে ব্যাংক কোন রকম বন্ধকী সম্পত্তি ছাড়াই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভূমিহীন কৃষকদের ঋণদান করছে এবং এই ব্যাংকের ঋণ আদায়ের হার শতকরা আটানব্বই ভাগ, যা পৃথিবীর যে কোন উন্নত ব্যাংকের সমতুল্য।[১৩] অন্য এক গবেষকের মতে, গ্রামীণ ব্যাংক এমন একটি অর্থ লেনদেনকারী সংস্থা যা গ্রাম বাংলার সর্বহারা নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর সংকট মোচন করে তাদের অধঃগমন প্রতিরোধ করা, দরিদ্রদের নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস, ঐক্য, আত্ম-সম্ভ্রম এবং চেতনা জাগ্রত করা যার ফলে তার ক্রমাগত জীবনধারণের মান উন্নয়নের সার্থক চেষ্টায় লিপ্ত।[১৪] মূলতঃ গ্রামীণ ব্যাংক এমন এক ধরনের ব্যাংকিং কর্মকান্ডে নিয়োজিত যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও ভিত্তহীন লোকদের জীবন মান উন্নয়নের অনবরত প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই ব্যাংকের ঋণদান কর্মসূচীর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঋণ প্রত্যাশীরা ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিবেন না; বরং ব্যাংকই তাদের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

যাবেন এবং ঋণ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন এবং বিভিন্ন আয়-অর্জনমূলক অর্থনৈতিক কাজে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবেন।

৪.১.৪ নিজেরা করি

১৯৭৪ সাল থেকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে 'নিজেরা করি' এর আত্মপ্রকাশ ঘটে যার মূল উদ্যোক্তা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীতে কর্মরত এলিজাবেথ হেলসিং নামের নরওয়ের এক মহিলা। এ সংস্থাটি গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে অসহায় ও শোষিত মানুষদের কেন্দ্র করে কাজ শুরু করে যা 'টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ' নামে পরিচিত। এ কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একান্তভাবে সমাজের সবচেয়ে অসহায় ও শোষিত মানুষের মধ্যে কাজ করা এবং কাজের পাশাপাশি উন্নয়ন উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করা।[১৫] অর্থাৎ, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্ব-প্রণোদিত হয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা যাতে প্রত্যেককে নিজের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে জোরদার করবে। 'নিজেরা করি'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মত এখানেও মহিলা কর্মীদের আধিক্য।[১৬] গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে নিজেরা করি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রামীণ ভূমিহীন জনগণের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা ও নিজস্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে তোলা এবং এ আন্দোলন যাতে নিজেদের মধ্য থেকে গড়ে উঠে এ লক্ষ্য নিয়ে 'নিজেরা করি' তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১৭]

৪.১.৫ প্রশিকা

১৯৭৫ সালে ঢাকা এবং কুমিল্লার কয়েকটি গ্রামে প্রশিকা পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে। তারপর এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৬ সালে এর প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বাংলা তিনটি শব্দ থেকে এই নামের উৎপত্তি - প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও

Dhaka University Institutional Repository

কাজ।[১৮] প্রশিকা মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে নতুন কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিকা বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যারা মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এবং সংযোজিত করেছে উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে। প্রশিকার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গ্রামীণ দরিদ্র লোকদের মধ্যে সংগঠন তৈরির কার্যক্রম প্রচলিত ছিল। এসব কার্যক্রমে গ্রামীণ ও শহরের বস্তির দরিদ্র ব্যক্তিদের (নারী ও পুরুষ) মধ্য থেকে ১৫-২০ সদস্য নিয়ে একটি দল গঠন করে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণধর্মী এপ্রোচকে অনুশীলন করা হয়। গ্রামীণ দরিদ্র ব্যক্তিদের উন্নয়নের কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে এই সংগঠনসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১৯] এছাড়া প্রশিকা উন্নয়নের সকলক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিতকরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য প্রশিকা তাদের সব কর্মসূচীতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে সমন্বিত উপায়ে নারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। বর্তমানে এদের ৯৮,৮৭৩টি গ্রুপ বা সংগঠন রয়েছে এবং শহর পর্যায়ে ১,৩১৬টি বস্তিতে এরা কাজ করে।[২০] মিরপুরে অবস্থিত প্রশিকার প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী বর্তমানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৪.১.৬ গণসাহায্য সংস্থা

গণসাহায্য সংস্থা ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ খুলনার ১৪টি গ্রামে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করে। বর্তমানে দেশের ৫৪টি জেলায় শ্রমজীবী নারী ও সিভিল সমাজের মধ্যে একাত্ম হয়ে কাজ করছে। গণসাহায্য সংস্থার কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ব্যবহারিক শিক্ষা, আইন শিক্ষা ও আইনী সহায়তা, আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি। তবে এর শিক্ষা কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের শিক্ষা কর্মসূচীর প্রধান কার্যক্রম ছয় ধরনের - (১) প্রাথমিক শিক্ষা

কার্যক্রম (২) কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কার্যক্রম (৩) বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম (৪) অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম (৫) এডুকেশনাল এডভোকেসি (৬) মান সম্মত শিক্ষা গবেষণা কার্যক্রম।[২১] গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, নারী, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের সাথে গণসাহায্য সংস্থা একাত্ম হয়ে কাজ করছে। এই সংস্থা নারী পুরুষের সমতা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবার তথা সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট এবং এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও গণসাহায্য সংস্থা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী কিছু কর্মসূচী চালু করেছে। এই কর্মসূচীর নাম "স্বনির্ভর ঋণ কার্যক্রম" যা কেবল শ্রমজীবিদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে অর্জিত পুঁজির দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৯৩ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া এই কার্যক্রম বর্তমানে ১১টি জেলার ৩৬টি থানায় ২৩৫টি ইউনিয়নে সর্বমোট ৫,২১২টি গ্রাম গণসংগঠনের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বর্তমান সময় পর্যন্ত ৫১,৭৩৭ জন সদস্য মোট ৪,৭১,৫২,২৯৬ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে এবং এই ঋণের কিস্তি আদায়ের হারও প্রায় ৯৮%।[২২] গণসাহায্য সংস্থা তেজগাঁও এ অবস্থিত তার প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা বা ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪.১.৭ বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (বি.ডব্লিউ.এইচ.সি.)

বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যার পাশাপাশি নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া ও তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মাতৃ মৃত্যু হার ও শিশু মৃত্যু হার রোধকল্পে এই সংগঠন মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নে টীকা, ঔষধ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এই প্রজেক্টে কর্মরত লোকবলের প্রায় ৮০% হচ্ছে নারী।[২৩] সংগঠনটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নারীর বিভিন্ন সমস্যা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করছে যার সুবিধা ভোগী নারী। ফলে নারীর অবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে এ সংস্থাটির অবদানও উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনের ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিস ছাড়াও ঢাকার মিরপুরে একটি প্রিন্টিং প্রজেক্ট রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে কর্মরত প্রতিটি এনজিও'র মূল লক্ষ্য হলো সমাজের পিছিয়ে পড়া অসহায় জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতাদানের মাধ্যমে আত্ম- নির্ভরশীল করে তোলা যাতে তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেহেতু নারীর সংখ্যাই আনুপাতিকহারে বেশি এবং সহায়-সম্বলহীন বলে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ থেকে বঞ্চিত ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাহিরে সেজন্য প্রায় প্রতিটি এনজিও নারী উন্নয়নের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করছে এবং নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে 'আশা'র বিভিন্ন ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়-উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত তাদের প্রায় সকল সদস্যই নারী। 'আশা' সহ সকল এনজিও'র কার্যক্রমকে প্রধান ২টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায়। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক দারিদ্র (Economic Poverty) দূরীকরণার্থে গৃহীত কার্যক্রম যার মাধ্যমে সদস্য/সদস্যাদের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে সহায়তাদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ মানব দারিদ্র (Human Poverty) দূরীকরণার্থে গৃহীত কার্যক্রম। যেমন - শিক্ষার প্রসার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি। এর মাধ্যমে সদস্যদের কার্য উপযোগী করে তোলার পাশাপাশি কাজের মান বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশে গত দু'দশকের এনজিও'র কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, দরিদ্র শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি সচেতনতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং শিক্ষা প্রসার বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসারে তাদের অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। আশা করা যায় যে, তাদের এসব কর্মসূচী ভবিষ্যতে আরো প্রসারিত হবে এবং কাংখিত পথে পরিচালিত হবে যাতে করে তার সুফল সমাজ দীর্ঘমেয়াদীভাবে ভোগ করতে পারে। তবে ইদানিংকালে কিছু কিছু এনজিও'র কর্মকান্ড নিয়ে বেশ নেতিবাচক বিতর্কের সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এমন অভিযোগ উঠেছে যে বিভিন্ন এনজিও দরিদ্র-জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্পের পিছনে ব্যয় না করে অনেক এনজিও'র কর্তা ব্যক্তির উচ্চ বেতন, বিলাসবহুল বাড়ী, গাড়ী, ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় করছে। আবার অনেকে এসব তহবিল ব্যবহার করে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে বলে বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে এবং অভিযোগ উঠছে। এসব অভিযোগ কতটা সত্য তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের খতিয়ে দেখা উচিত এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনাকাংখিত বিতর্কের অবসান ঘটানো জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে জরুরী।

৪.২ নারী উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা

401329

বিশ্বে নারী উন্নয়ন আজ একটি বহুল আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী এবং যাদের অধিকাংশই উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাহিরে। অথচ সুষ্ঠু ও টেকসই উন্নয়নের জন্য এই বিপুল সংখ্যক নারীকে মানব সম্পদে পরিণত করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর দিকে তাকাই তবে নারীর এই দুর্দশার চিত্র আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। তাই বর্তমান এ অবস্থার নিরসন করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য জাতীয় সরকারের পাশাপাশি এনজিও সমূহ বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে। এ বিষয়ে অর্থাৎ, এনজিও'র ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এনজিও বলতে কি বুঝায় সে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া উচিত। এনজিও হচ্ছে ক্রমপ্রসারমান নেটওয়ার্ক যা স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে গঠিত নাগরিকদের যে কোন অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, যার কার্যক্রম সদস্যদের ইচ্ছে দ্বারা নির্ণীত হয়।[২৪] এনজিও (NGO) হচ্ছে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এ বিবেচনায় সরকারের নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতিরেকে অলাভজনক সকল প্রতিষ্ঠানকেই এনজিও বলা চলে।[২৫] আবার নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণী পর্যালোচনা শীর্ষক উবিনীগ এর এক কর্মশালায় ব্যক্ত এক গবেষকের মতে, সাধারণ অর্থে এনজিও হচ্ছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যা বৈদেশিক সাহায্য কিংবা দেশীয় বিভিন্ন লোকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, অর্থ সাহায্যকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত যেসব সংস্থা তারাই এনজিও।[২৬] তাহলে এটা বলা যায় যে, এনজিও হচ্ছে কোন বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন রুলস দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ ভূমিকা রাখে। তবে বর্তমানে এনজিও সমূহ সংজ্ঞায়িতকরণের ক্ষেত্রে দু'টি ধারা প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ (ক) উদার অর্থে সমাজের প্রতিটি সংস্থা যারা সরকারের অংশ নয় এবং সুশীল সমাজের মধ্যে কাজ করে, যেমন-রাজনৈতিক দলসমূহ, শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, ধর্মীয় সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভিন্ন সংঘ, ক্রীড়া সংস্থা, শিল্প এবং সাংস্কৃতিক সমিতি, ব্যবসায়ী সমিতি, বণিকসংঘ, পেশাজীবি সমিতি সমূহ এবং সেই সংগে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ব্যবসায় সমূহ সবগুলোই বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও; (খ) সংকীর্ণ অর্থে এনজিও বলতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত সেইসব বিশেষ ধরনের সংস্থাকে বোঝানো হয়েছে যারা মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সম্ভাবনার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য জনগণের সঙ্গে কাজ করে।[২৭] তবে উপরিউক্ত উভয় অর্থের সংজ্ঞারই আবার যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং বিভিন্ন সমস্যারও সৃষ্টি করে। যেমন-উদার সংজ্ঞার ব্যাপকতা এত বিশাল এবং এত বিচিত্র ধরনের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করায় এ সংজ্ঞাটি অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর মনে হয়। আবার সংকীর্ণ অর্থের সংজ্ঞায়ও গন্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই। কেননা সকল এনজিও সেবাকর্ম নিয়ে নিয়োজিত নয়; বরং অনেক এনজিও সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশের প্রধান প্রধান ইস্যু নিয়ে কাজ করে। বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও শব্দটির দ্বারা সেসব সংস্থাকে বুঝানো হয় তাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:[২৮]

ক) স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে গঠিত সংস্থা যেখানে বোর্ড সদস্য অথবা সাধারণ সদস্য কিংবা উপকারভোগী প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় সংস্থার জন্য সময় দেবেন;

খ) সমাজের বিদ্যমান আইনের অধীনে এসব সংস্থা অথবা এর গঠনকারীরা স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে;

গ) এসব এনজিও বা বেসরকারী সংস্থাসমূহ অলাভজনকভাবে পরিচালিত হবে। তবে তাদের আয়-সৃজনী কর্মকান্ড থেকে যে উদ্বৃত্ত থাকবে তা পুরোপুরিভাবে তাদের সংগঠনের লক্ষ্য পূরণের কাজে ব্যবহৃত হবে; এবং

ঘ) এসব সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে সমাজের সেইসব সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অবস্থা এবং সম্ভাবনা উন্নত করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করা যাতে অধিকার বঞ্চিত মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং সার্বিকভাবে সমাজের মঙ্গল, পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনার জন্য যেসব বিষয় এবং প্রেক্ষিত ক্ষতিকর সেগুলোর বিপক্ষে কাজ করা।

উপরিউক্ত প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিটি গণতান্ত্রিক সমাজেই বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব বা সমিতি রয়েছে যারা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নাগরিক, সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। সর্বশেষে বৈশিষ্ট্যটি মূলত: লক্ষ্য এবং সমাজের অধিকার বঞ্চিত, অবহেলিত এবং অসচেতন জনসাধারণের কল্যাণে তথা সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে বা সমাজের কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর এসব বিষয়ের বিপক্ষে কাজ করে থাকে।

এনজিও সমূহকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - (ক) বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্য-পুষ্ট এনজিও এবং (খ) স্থানীয় এনজিও। বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও প্রধানতঃ The Foreign Donation (Voluntary Activites) Regulation

Dhaka University Institutional Repository

Ordinance-1978 এবং The Foreign Contribution (Ordinance –1982) এর অধীনে প্রণীত রুলস দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের কার্যক্রম এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সমন্বয় করে থাকে। স্থানীয় এনজিও সমূহ The Voluntary Social Welfare Agencies Registration & Control Ordinance, 1961- এর বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত এবং সরকারের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর এদের কার্যক্রম সমন্বয় করে থাকে।[২৯]

বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ কী ধরনের ভূমিকা রাখছে বিশেষ করে নারী উন্নয়নে এদের ভূমিকা কতটুকু তা পর্যালোচনা করা আলোচ্য অংশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ প্রসঙ্গে এনজিও কার্যক্রমের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশেষ করে বাংলাদেশে এনজিও'র কার্যক্রম শুরুর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। বর্তমানে উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব ও মডেল বিদ্যমান। এর মধ্যে আধুনিকীকরণ তত্ত্বের মডেল অনুযায়ী পুঁজিবাদী পন্থায় সামাজিক উন্নয়ন মূলতঃ পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা এবং অভিজ্ঞতার ফসল। আধুনিকীকরণ এপ্রোচ অনুযায়ী জাতিসমূহের তুলনামূলক সুবিধা নীতির ভিত্তিতে উদ্যোক্তা শ্রেণী কর্তৃক পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও বৃহৎ উৎপাদনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সম্পদ সৃষ্টি করে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু এখানে বাস্তবতা হলো এরূপ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৃহৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠী দরিদ্রই থেকে যায় এবং সম্পদশালীরা আরো সম্পদের অধিকারী হয়। এ তত্ত্ব মৌলিক কেন্দ্র-বহির্ভাগ (centre-periphery) সমস্যা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ। ফলে ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বিনিময়ে পুঁজিবাদীদের ক্ষমতা নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে নির্ভরশীলতা তত্ত্বে বিশ্বাসী তাত্ত্বিকেরা (dependency theorists) পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক কাঠামোগত দিকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মূলতঃ উভয় তত্ত্বেই মনে করা হয় যে, বাজার শক্তি এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তির সমন্বয়ে জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভব। অর্থাৎ, উভয় তত্ত্বেই শিল্পায়ন এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদনকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এতসব তত্ত্ব এবং মডেল বিচার বিশ্লেষণ বা প্রয়োগের পরও বিশ্বে ধনী-

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্রের ব্যবধান কমেনি। প্রায় প্রতি সমাজে ব্যাপক জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সুফল ভোগ থেকে বঞ্চিত। সমাজের এসব অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিতদের সাহায্যার্থে এবং তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যেই এনজিওদের আত্মপ্রকাশ। এনজিও কর্তৃক গৃহীত এপ্রোচকে বলা হয় লক্ষ্যকেন্দ্রিক এপ্রোচ, গণকেন্দ্রিক উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ, প্রসেস কেন্দ্রিক বা অংশগ্রহণকেন্দ্রিক এ্যাপ্রোচ যা মূলতঃ সংস্কারমূলক এ্যাপ্রোচ বা পূঁজিবাদী উন্নয়নের আধুনিকীকরণ এ্যাপ্রোচ এবং যা বিদ্যামান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সমাজে বিদ্যমান দারিদ্রের সমস্যা হ্রাসকরণের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। এনজিও এপ্রোচ নির্ভরশীলতার প্রেক্ষাপট থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে ভিন্নঃ[৩০]

১. নির্ভরশীলতা তত্ত্ব মূলতঃ আধুনিকীকরণ তত্ত্বের সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে এনজিও এপ্রোচ কর্মভিত্তিক এবং উন্নয়নের বিকল্প এপ্রোচ সুপারিশ করে।

২. নির্ভরশীলতার তত্ত্বে যেখানে প্রয়োজনে বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক শ্রেণী বিলোপ সাধনের কথা বলে সেখানে এনজিও এপ্রোচ ক্রমাগত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যমান কাঠামো পরিবর্তনের কথা বলে।

এনজিও এপ্রোচে জনগোষ্ঠীই হলো মূল বিবেচ্য বিষয় এবং এর কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা হলো জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি, সমতা বিধান এবং সহনীয়তা সৃষ্টি (Korten: 1983)।[৩১] এনজিও এপ্রোচে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক প্রচেষ্টার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়, ফলে সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, বহিঃসম্পদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, দলীয় সম্পদ সম্প্রসারণ, উন্নত স্থানীয় উদ্যোগ, অর্থনৈতিক শৃংখলা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এই এনজিও এপ্রোচ এর স্তম্ভ হলো নমনীয়তা, উদ্ভাবন, ও সর্বোচ্চ দক্ষতা। এভাবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন এনজিও উন্নয়নশীল ও তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এরূপ আর্ত-মানবতার সেবা কিংবা কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও'র ভূমিকা বেশি দিনের নয়। মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকেই ইউরোপের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ কর্মসূচী এবং পুনর্বাসন কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে এনজিও কার্যক্রমের যাত্রা শুরু যা পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও সম্প্রসারিত হয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মূল খ্রীস্টিয়ান মিশন, সালভেশন আর্মি বা ক্যাথলিক রিলিফ কার্যক্রমের মধ্যেই এনজিও'র ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীর আন্দোলনকালীন সময়েই বলা চলে তৃতীয় বিশ্বে তথা ভারত উপমহাদেশে এনজিও কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। আর এনজিও কার্যক্রম একটা আন্দোলনে রূপলাভ করে মূলত: সাম্প্রতিক সময়ে। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে এনজিও কার্যক্রমের প্রসার লাভ করার অনেক কারণ রয়েছে। এসব কারণ বিশ্লেষণ করে সংক্ষেপে বলা যায় যে, দারিদ্রতা, দুর্যোগ, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সংকট ইত্যাদি মূলতঃ তৃতীয় বিশ্বে এনজিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের পটভূমি বা ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে T. H. Fox মন্তব্য করেন - When someone perceive a need, an NGO is likely to follow.[৩২] কি কি কারণে তৃতীয় বিশ্ব বা উন্নয়নশীল দেশে এনজিও কার্যক্রম শুরু বা প্রসার লাভ করেছে তা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়ঃ

(১) এনজিও কার্যক্রম পল্লী এলাকা নিয়ে বিশেষভাবে যে সব স্থানে সরকারী সেবা কাঠামোর মাধ্যমে প্রায় অনেক ক্ষেত্রে সেবা দান সম্ভবপর হয় না। ফলে এনজিও সমূহ তৃণমূল পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে অন্য যে কোন সংস্থার চেয়ে উন্নয়নের সমস্যাসমূহ পরিষ্কারভাবে অনুধাবন ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম।

(২) এনজিও কার্যক্রমের আর একটি অন্যতম ভিত্তি হলো রাজনৈতিক, শিল্পপতি বা আমলা শ্রেণীর কার্যক্রমের অকার্যকারিতা। যেমন - রাজনৈতিক এলিটদের তৃণমূল পর্যায়ে গণ সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণে অবহেলা বা অনিচ্ছা, শিল্পপতি কর্তৃক পল্লীভিত্তিক নতুন

কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক কর্ম সৃষ্টিতে অপারগতা বা অনীহা এবং সর্বোপরি আমলা কর্তৃক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অকার্যকর ভূমিকার ফলেই এনজিও সমূহ এসব অবস্থার উন্নয়ন ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে আসে।

(৩) যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাছাড়া দরিদ্র দেশসমূহকে প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা বহিঃসম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদ অব্যবহৃত থেকে যায়। গ্রামবাসী যেহেতু বাহিরের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, সে কারণে তাদের নিজস্ব সম্পদের গতিশীলতাও হ্রাস পায় এবং উন্নয়নমুখী কর্মসূচীতে ব্যবহৃত সম্পদ হ্রাস পেতে থাকে। এক্ষেত্রে এনজিওরা তাদের ক্ষমতায়ন এপ্রোচের মাধ্যমে উন্নত সুযোগ সৃষ্টি করে নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে।

(৪) জনগণের প্রয়োজনানুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এনজিও কার্যক্রম সংগঠিত হওয়ার আর একটি অন্যতম কারণ। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সরকারের ব্যর্থতায় উন্নত দেশসমূহের হতাশার কারণে তারা এনজিও'র মাধ্যমে বহুপাক্ষিক এবং দ্বি-পাক্ষিক সহায়তামূলক কার্যক্রম শুরু করে। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা এনজিও সমূহকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার জন্য সরাসরি ও সহজ মাধ্যম হিসেবে দেখে আসছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর নারী উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা আরো উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের অবস্থান অসম বলে পর্যায়ক্রমে তা রাষ্ট্র, সমাজ, আইন প্রয়োগ তথা মানুষের ধ্যান-ধারণার মূলেও প্রবেশ করে। এমনকি চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে নারী তার শ্রেণীর ভিত্তিতে অবস্থানগত দিক থেকে, অন্যদিকে নারী হিসেবে সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমিত পরিবার গন্ডিতে

Dhaka University Institutional Repository

আবদ্ধ করে রেখেছে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবধান, সংস্কৃতিগত বাধা, ধর্মীয় বিধি নিষেধ, সামাজিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও রীতিনীতি তথা আচার অনুষ্ঠান।[৩৩] এরূপ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সরকার তার উন্নয়ন কর্মসূচীতে নারী উন্নয়নকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করে আসছে। সেই সাথে দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদানের পাশাপাশি সরকার তার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্ধ করে আসছে। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক উন্নয়ন ধারায় নারীর অংশগ্রহণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন মূলত সত্তর দশকের শুরুতে। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ খুব বেশি দিনের নয়। ৭০ এর দশকে গ্রাম উন্নয়ন, দরিদ্র জণগণের দারিদ্র হ্রাসের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহ থেকে তহবিল ও কর্মসূচী নিয়ে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নতুনভাবে কাজ শুরু করে।[৩৪] এনজিওগুলো মূলতঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টাকা বিনিয়োগের প্রতি মনোযোগ, নারীর আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়, ঋণদান কর্মসূচী স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা ইত্যাদি প্রকল্প ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করছে।[৩৫] বর্তমানে বাংলাদেশে কতগুলো এনজিও কাজ করছে তার সঠিক সংখ্যা নিরূপন কষ্টসাধ্য। প্রাপ্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৯৯৬ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট এনজিওর সংখ্যা ১০১৪টি এবং গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা ৩৫০৯ টি যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি নারী উন্নয়নমূলক বহু প্রকল্প গ্রহণ করছে। এনজিও কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী, অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সচেতনতা সৃষ্টি, সৃজনশীল শিক্ষা কর্মসূচী, স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী, নারী নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী, অবকাঠামোর উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নারী সমাজকে সত্যিকার মানব সম্পদে পরিণত করে নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওরা ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে নারী উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সাথে সম্পৃক্ত করে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

রাখছে। ফলে বাংলাদেশের নারী সচেতন হচ্ছে এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধির মাধ্যমে সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সৃজনশীল ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিত্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজের ভাগ্যের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। অর্থাৎ, নারী আজ উপার্জন ক্ষমতার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর নারীর এসব প্রচেষ্টার সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে এনজিও। কারণ এনজিও'র মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতাহীন নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের সুপ্ত সম্ভাবনা জাগ্রত করে কাজে লাগানো। অর্থাৎ, নারীর চিন্তা, কথা, কাজ, সংগঠন ইত্যাদির ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১। মুহাম্মদ সামাদ, *বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্যমোচনে এনজিওর ভূমিকা,* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ ৫৪।

২। John G. Cull and Richard E. Hardy, *Voluntarism: An Emerging Profession* (Illinois, 1974): p.5.

৩। Mohiuddin Ahmad (ed), *Bangladesh in the New Millennium,* Community Development Library, 2000, p. 417.

৪। Begum Najma Ara, *Role of NGOs in Social Development*, Department of Social Services, Ministry of Social Welfare, Dhaka, Bangladesh, 1999.

৫। Mohiuddin Ahmad, *Op. Cit,* p.418.

৬। Mohiuddin Ahmad, *Op. Cit,* p.418.

৭। Dewan A. H. Alamgir, *Achieving Financial Viability by A Large Micro Finance Institution (MFI): The Association for Social Advancement (ASA) in Bangladesh,* Credit and Development Forum (CDF), Bangladesh, Case Study Series-1, p. 11.

৮। *New Vision,* A House Journal of ASA, Vol. 29, June, 2001, p.4.

৯। আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে উন্নয়ন সমস্যা এবং এনজিও মডেল,* প্রচিন্তা প্রকাশনী, ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ ১১৯।

১০। তাহমিনা আখতার, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট,* বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ ১৫৫।

১১। ড. নাজমা চৌধুরী, *নারী ও উন্নয়ন: প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান,* উইমেন ফর উইমেন, মার্চ, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ ১৬৪।

১২। তাহমিনা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২০০।

১৩। মাহমুদ শফিক, *গ্রামীণ ব্যাংক: দারিদ্র নিরসনের সফল উদ্যোগ*, ১৯৯০, পৃ ১১।

১৪। Dr. J.K. Roy, *Bangladesh Grameen Bank: Ekti Sofol Udvavoni Sangstha*, 1993

১৫। নাজমা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭১।

১৬। আনু মুহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২৬।

১৭। আনু মুহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২।

১৮। *Proshika At a Glance,* July, 1993, Dhaka, p. 4.

১৯। *Proshika - 24 Years in Sustainable Development,* Proshika, Dhaka, p.1

২০। *Ibid,* p. 1

২১। *গণসাহায্য সংস্থার দিনলিপি*, জি.এস.এস, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ ১৩।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ ১১।

২৩। নাজমা চৌধুরী, নারী ও উন্নয়ন: প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ ১৭৪।

২৪। সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থার ভূমিকাঃ বেসামরিক সমাজের অভ্যুদয়, *জাতিসংঘ সংবাদ*, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুলাই-১৯৯৫, পৃ-৪, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ ৪।

২৫। আনু মাহমুদ, *বাংলাদেশে এনজিও: দ্রারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। লতিফা আকন্দ, নারী উন্নয়নে বেসরকারী দৃষ্টিভঙ্গী, নারী উন্নয়ন: নীতি নির্ধারণী পর্যালোচনা শীর্ষক, উবিনীগ কর্মশালা (৮ম কর্মশালা), ১৯৮৬, *নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা*, পৃ ৩৪।

২৭। *এনজিও: উত্তম নীতি এবং পদ্ধতি নির্দেশিকা*, কমনওয়েলথ এনজিও লিয়াঁজো ইউনিট, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ১৮।

২৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯।

২৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭।

৩০। NGO Approach: Is It a Formal Theory of Development, Research and Evaluation Division, BRAC, Dhaka, September 1989, p. 2.

৩১। *ibid* , p. 2.

৩২। TH, Fox, NGOs from the United States, World Development, 15, 1987 (মূল- NGO from the 3rd World: Their Role in Development Cooperation).

৩৩। রাশেদা আক্তার, উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও: গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন: একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, *ক্ষমতায়ন*, ১৯৯৬, সংখ্যা-১, পৃ ১।

৩৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬।

৩৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট ('আশা') এর কর্মকান্ড ও পরিচিতি

বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম দেশ। মোট ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তন সম্পন্ন এই দেশে বর্তমানে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন লোক বসবাস করছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার, স্বাস্থ্যসেবা, মানব সম্পদের দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এখনও পিছিয়ে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সত্যিকার মানব সম্পদে পরিণত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে পারলে দেশের উন্নয়ন কাংখিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব না হলেও লক্ষ্যের কাছাকাছি নেয়া সম্ভব হতো। কিন্তু বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা সনাতন পদ্ধতির, আমলাতান্ত্রিক, সুশৃংখল ও সমন্বিত না হওয়ার কারণে কাংখিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ফলে উন্নয়ন প্রচেষ্টার সুফল তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ভোগ করতে সক্ষম হয়নি। আবার এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক যারা নারী তাদের অবস্থা আরো প্রতিকূল। সামাজিক বা জাতীয় জীবনে বিভিন্ন দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে নারী আরো অনেক পিছিয়ে। ফলে সত্তর দশকের শেষার্ধে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হতে থাকে এবং নারী কেন্দ্রিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা শুরু করে।

বাংলাদেশের নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এর অন্যতম কারণ হলো শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও সচেতনতার অভাব। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ও নিজের অধিকার সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা থাকে না। তাই সমাজের দুর্বলতম জনগোষ্ঠীর জন্য কাংখিত সুবিধা প্রদানের জন্য সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয়ে মৌলবাদীদের প্রচুর

Dhaka University Institutional Repository

বাধা বিপত্তির মুখেও কতিপয় তরুন 'আশা' গঠনের শপথ নিল যার মূল ভিত্তি স্থির করা হয়েছিল গ্রাম বাংলার তৃণমূল পর্যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সাল থেকে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কর্মকান্ড শুরু করে। 'আশা'র উৎপত্তি ও কর্মকান্ডকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়:

৫.১ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট ('আশা') এর উৎপত্তি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশটির পুনর্গঠনের প্রয়াসে সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা নানামুখী ভূমিকা গ্রহণ করে, তৎকালীন সরকারী উদ্যোগে যে ত্রাণ তৎপরতা চালানো ও সাহায্য দেয়া হয়েছিল তা দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর গতানুগতিক, আমলাতান্ত্রিক, অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমস্যা থাকায় তা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়।[১] তাই সমাজের দুর্বলতম জনগোষ্ঠীর কাংখিত সুবিধা প্রদানের জন্য সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থেকে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (আশা) এর যাত্রা শুরু হয়। 'আশা'র গৃহীত কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হলো সমাজের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুবিধা বঞ্চিত নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় হলো ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা ও আয় অর্জন, সমন্বিত স্বাস্থ্য কর্মসূচী, মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ইত্যাদি।[২]

Dhaka University Institutional Repository

'আশা' তার সৃষ্টির শুরু থেকেই এসব লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলছে। বর্তমানে 'আশা'র কর্মকান্ড অনেক বিস্তৃত এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) বাংলাদেশের অন্যতম একটি বৃহত্তর এনজিও হিসেবে প্রায় ১৫ লক্ষ পরিবারকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করেছে।[৩] এর ফলে একদিকে যেমন সম্পৃক্ত পরিবার সমূহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারছে তেমনি তারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নেও অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

৫.১.১ 'আশা'র পরিচালনা পরিষদ

আশার সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। এর মধ্যে ১ জন সভাপতি, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন সদস্য সচিব এবং ৪ জন সদস্য রয়েছেন। সদস্য সচিব যিনি সংগঠনটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পরিচালনা পরিষদ মূলতঃ বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ডে জড়িত।

৫.১.২ 'আশা'র উদ্দেশ্য

তৃণমূল পর্যায়ে দুর্বল, ভূমিহীন অর্থাৎ সমাজের দরিদ্রতম জনগণকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে সাহায্য করা ইত্যাদি 'আশা'র মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও যে সমস্ত প্রধান উদ্দেশ্যে 'আশা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো:[৪]

১। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

২। ভূমিহীন ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন;

৩। নারীর মর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যষ্টিক স্তরে বাড়তি উপার্জনের সহায়তা দান; এবং

Dhaka University Institutional Repository

৪। স্থানীয় ঋণদাতার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস।

'আশা'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সমূহকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে যার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতাদানের মাধ্যমে নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

৫.১.৩ 'আশা'র মূলধনের উৎস

'আশা' ফেরতযোগ্য মূলধন নিয়ে আর্থিক সেবার সুযোগ সৃষ্টি করে, অনুদান নির্ভর নয়। 'আশা' বিভিন্ন উৎস থেকে মূলধন নিয়ে কাজ করে। নিম্নে বিভিন্ন উৎস থেকে (ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত) ফেরতযোগ্য মূলধন দেখানো হলো:[৫]

ডিসেম্বর ৩১, ২০০১ পর্যন্ত আশা'র তহবিল

উৎসের নাম	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	মোট তহবিলের অংশ
সদস্যদের সঞ্চয়	১,৬৯৬.১৬	২৪.১৫%
পিকেএসএফ	২,১৮৪.৩৩	৩১.১১%
CORDAID ঋণ	৫০.৩৪	০.৭২%
আশা'র নিজস্ব	২,২৪৭.০৩	৩২.০০%
অন্যান্য	৮৪৪.১৭	১২.০২%
মোট	৭,০২২.০৩	১০০%

৫.১.৪ 'আশা'র কর্মপরিধি (ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত)

আশা সৃষ্টির পর থেকে তৃণমূল পর্যায় কাজ করে আসছে যার মূল লক্ষ্য হলো সমাজের দরিদ্র নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। গত দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে সংগঠনটি ক্ষুদ্র

Dhaka University Institutional Repository

ঋণের ক্ষেত্রে বিশেষায়ন অর্জন করছে এবং এ সময় সংস্থাটি কর্তৃক সম্পাদিত ও গৃহীত কর্মকান্ড সবিস্তারে উপস্থাপন করা কিছুটা কঠিন ব্যাপার। নিচের টেবিলে 'আশা'র প্রধান প্রধান দিকের সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

'আশা'র প্রধান প্রধান দিকের সার্বিক পরিসংখ্যান (৩১ ডিসেম্বর, ২০০১):[৬]

১।	দল (গ্রুপ)		৭৪,২৪৬
২।	ঋণ গ্রহীতাঃ নারী	১৩,৫৩,৯৯২	
	পুরুষ	৬০,৯৩৯	১৪,১৪,৯৩১
৩।	শাখা		১০৬০
৪।	অঞ্চল		১৪৫
৫।	বিভাগ		২৩
৬।	জেলা		৬৪
৭।	বছরব্যাপী ঋণ বিতরণ (আসল টাকার পরিমাণ)		৯৯৬,৬৬,৫৩,০০০
৮।	বছরব্যাপী আদায়ের পরিমাণ (আসল)		৮৫৯,২৬,৬০,৯১৮
৯।	বকেয়ার পরিমাণ (আসল)		৫৩৫,৯২,৪৬,৫৮৪
১০।	বছরব্যাপী সঞ্চয় বিনিয়োগ		১৮১,২৯,১৫,৩৯৯
১১।	আদায়ের হার		৯৯.৯৩%
১২।	স্টাফ সদস্য (ক্ষুদ্র ঋণ)		৬,৪২২
১৩।	সার্ভিস চার্জ থেকে আয়		১২৮,৭৭,৬৫,২৪৯
১৪।	ব্যয় (তহবিল ব্যয়, কু-ঋণ, আরোপিত ব্যয়)		১০৫,১৫,৩৯,৯৪৩
১৫।	আর্থিক সাসটেইনএ্যাবিলিটি হার (SOS)		১২৮.০৭%

৩১ ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত 'আশা'র গ্রুপ সদস্যদের মোট সঞ্চয়ের উদ্বৃত্ত ১৬৯,৬১,৬৩,৮৪০ টাকা এবং এ সময় পর্যন্ত মোট পূঞ্জীভুত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪০৯৯,৩৯,৪২,৯৯৩ টাকা।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.৫ 'আশা'র বৈশিষ্ট্যসমূহ

'আশা' একটি ব্যতিক্রমধর্মী বেসরকারী সংস্থা যার কর্মকান্ড পরিচালিত হয় মূলতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় গঠন, আয়-স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং জীবন সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে সংগঠনটি যেসব স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ:[৮]

১। সাপ্তাহিকভিত্তিতে উন্নয়নকর্মী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ;

২। গ্রুপ গঠন এবং দলীয় কার্যক্রমে ঐক্য আনায়ন;

৩। ঋণ কর্মসূচীর দ্বারা আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ;

৪। সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র সঞ্চয় গঠন;

৫। প্রতিষ্ঠানগত ব্যয় নির্বাহে ১৫% সার্ভিস চার্জ আদায়;

৬। বিকেন্দ্রীকৃত পরিচালনা ব্যবস্থা;

৭। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রদত্ত ঋণের কিস্তি আদায়;

৮। প্রায় ১০০% কিস্তি আদায়;

৯। ৬/৭ বছরের মধ্যে সমুদয় ঋণ ফেরতদান; এবং

১০। পারিবারিক কার্যক্রমে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

বস্তুতপক্ষে 'আশা' বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে গরীব ও ভূমিহীনদের আর্থ-সামাজিক এবং স্থানীয় উন্নয়নের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে যার মাধ্যমে 'আশার' সদস্যগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ নারী উন্নয়নের জন্য 'আশা' কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ

'আশা' তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীগ্রহণ ও তার সফল বাস্তবায়ন করে জাতীয় উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ১৯৮৯ সালে মাত্র ৪ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে 'আশা'র ঋণদান কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে 'আশা' ৬৪টি জেলার প্রায় ৪৩৬টি উপজেলায় ১৪৫টি এরিয়ায় ১০৬০টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে প্রায় ১৫ লক্ষ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা/সেবা প্রদান করছে যা দরিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকৃত পরিবারের ১৩% এবং এনজিও কর্তৃক আর্থিক সেবার আওতায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭%[৯]। দারিদ্র পীড়িত, অসহায়, দুঃস্থ জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে 'আশা' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে নারীর উন্নয়নে এবং আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে ঋণদান কর্মসূচী। 'আশা' কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমাগত ঋণ বিতরণ হয়েছে প্রায় ৪০৯৯ কোটি টাকা এবং যার আদায়ের হার ৯৯.৯৩%[১০]। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে নারী উন্নয়নে 'আশা' কর্তৃক বিভিন্ন ঋণদান কর্মসূচীগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণদান কর্মসূচী; ও

খ) সামাজিক উন্নয়নে ঋণদান কর্মসূচী।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন তথা নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'আশা'র উপরিউক্ত ঋণদান কর্মসূচী নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায় ঃ

৫.২.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'আশা'র ঋণদান কর্মসূচী

বাংলাদেশের নারী প্রধানত: দু'টো দিক থেকে নির্যাতিত হয়। এর একটি হলো পুরুষশাসিত সমাজ কর্তৃক নারী এবং অপরটি হলো স্বামী কর্তৃক স্ত্রী। এরূপ নির্যাতিত হবার পিছনে যেসব

Dhaka University Institutional Repository

কারণ বিদ্যমান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাঁচার প্রয়োজনে স্বামীর আয়ের উপর নারীর নির্ভরশীলতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী, সম্পদের মালিকানায় নারী বৈষম্যের স্বীকার, শিক্ষায় অনগ্রসরতা এবং অসচেতনতার কারণে ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা প্রয়োগে অক্ষমতা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে 'আশা' কর্তৃক প্রবর্তিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক ঋণদান কার্যক্রম বর্তমানে 'আশা'র চলমান কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বিশেষ করে নারীকে ঋণে অন্তর্ভুক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পরিবারের আয় এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিই হচ্ছে 'আশা' কর্তৃক চালুকৃত উপার্জনমুখী ঋণদান কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এর ফলে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। নিচে 'আশা' কর্তৃক প্রবর্তিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণ কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো ঃ

৫.২.১.১ নারীর জন্য আয়বর্ধকমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি

'আশা' কর্তৃক চালুকৃত অর্থনৈতিক ঋণ কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান উপাদান হলো সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নারীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। কারণ দরিদ্র জনগণ বংশানুক্রমে জীবন ধারণের জন্য ঋণের উপর নির্ভরশীল। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, দরিদ্র জনগণের অসহায়ত্বের সুযোগে মহাজন শ্রেণী তাদের নিকট থেকে ১২০% বার্ষিক সুদ আদায় করে থাকে এবং এই ঋণের জন্য বিভিন্ন সম্পত্তি বন্ধক প্রয়োজন হয় যার ফলে সামাজিক নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়[১১]। এরূপ উচ্চ সুদের ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনে ইতিবাচক এর পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অথচ এসব দরিদ্র জনগণ যদি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পেতো তবে তা বিভিন্ন আয়-অর্জনকারী প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজে লাভভান হতে পারতো তেমনি তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারতো। উদাহরণস্বরূপ একজন রিক্সাচালক জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও একটি রিক্সার মালিক হতে পারে না। কারণ একজন রিক্সাচালকের পক্ষে একসাথে

Dhaka University Institutional Repository

৮/৯ হাজার টাকা যোগাড় করে একটি রিক্সা ক্রয় করা সম্ভব হয় না। ফলে স্থানভেদে ২০ থেকে ৪০ টাকা দৈনিক ভাড়ায় মহাজনের রিক্সা চালাতে হয়। কিন্তু 'আশা' থেকে ঋণ নিয়ে রিক্সাচালক নিজে রিক্সা ক্রয় করে সময়মত সাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে নিজেই একদিকে রিক্সার মালিক হচ্ছে তেমনি সংসারের জন্য বাড়তি আয়েরও ব্যবস্থা করছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও মূলধনের অভাবে দরিদ্র নারীর অবস্থা আরো খারাপ। ফলে তারা সহায়-সম্বলহীন, উপার্জনহীন এবং অন্যের করুণার পাত্রী হয়ে অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। এ ধরনের অবস্থা থেকে দরিদ্র নারীকে মুক্ত করতে 'আশা' সামান্য সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ধান ভাঙ্গা, চাল শুকানো, রিক্সা ও ভ্যান চালনা, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র খামার, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে[১২]। এসব কর্মসূচীর ফলে পুরুষের পাশাপাশি নারীর মাধ্যমে পরিবারে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, যা নারীর অবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। 'আশা'র এ ঋণদান কর্মসূচীর প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায় :

অ) গ্রামীণ মহাজন বা দাদন ব্যবসায়ীদের উপর নারী-পুরুষের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা;

আ) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে নিজের তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করা; এবং

ই) নারীর আয় স্বয়ম্ভরতা অর্জনে ভূমিকা রাখা।

৫.২.১.২ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

জীবনযাত্রার মান অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন- খাদ্য গ্রহণের মাত্রা ও পুষ্টির পরিমাণ, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি। আর এসব প্রতিটি বিষয়ের জন্য দরকার অর্থ। অর্থাৎ, যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তারা উপরিউক্ত সুবিধাসমূহ প্রয়োজনীয় মাত্রায়

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ করতে পারে। তাই বলা যায় যে, যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল তাদের জীবনযাত্রার মানও অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছলদের চেয়ে উন্নত। 'আশা' কর্তৃক ঋণদান কর্মসূচীরও মূল লক্ষ্য ঋণগ্রহীতার জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন। এক্ষেত্রে 'আশা' দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। 'আশা' ৩১ ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত প্রায় ১৩,৫৩,৯৯২ জন মহিলাকে ঋণ দিয়েছে যার আদায়ের হারও প্রায় ১০০%[১৩]। এসব মহিলা ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন উপার্জনমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। ফলে এক সময় যে নারী সম্পূর্ণভাবে তার স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল, স্বামীর অনুগ্রহে বেঁচে ছিল এবং পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যার কোন ভূমিকাই ছিল না বা থাকলেও নগণ্য পর্যায়ে ছিল সেই নারীই একমাত্র উপার্জন করতে পারার কারণে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এখন পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছল হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধনও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সে আর তার স্বামীর উপহাস বা অবহেলার পাত্রী নয় বরং অধিকার সচেতনতার কারণে একে অপরের জীবনের অংশীদাররূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

৫.২.১.৩ সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টি

'আশা' তার গ্রুপের সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। বর্তমানে একজন নতুন সদস্যকে সপ্তাহে ৫/- টাকা এবং পুরাতন সদস্যকে সপ্তাহে ১০/- টাকা সঞ্চয় করতে হয়। এভাবে ব্যাপক সংখ্যক সদস্যের সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয় এবং নিজস্ব তহবিল গড়ে উঠে। এই তহবিলই 'আশা' তার নিজস্ব নীতি ও পলিসির ভিত্তিতে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে যা ঋণগ্রহীতারা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ করতে পারছে। ফলে তারা বাড়তি আয়ের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথে অগ্রসর হতে পারছে। তাছাড়া 'আশা' তার সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর ৮% সুদ দিয়ে থাকে[১৪]।

৫.২.২ সামাজিক উন্নয়নে ঋণদান কর্মসূচী

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার সঠিক মানোন্নয়নের জন্য সামাজিকতার বিকাশ অপরিহার্য। বাংলাদেশের নারীর জনসমক্ষে বের হওয়া অনেকটা বিদ্যমান নীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থি। জনকলাণমূলক কাজে অংশগ্রহণও অনেকটা সীমিত যার ফলে আত্ম-উন্নয়নের সুযোগও সীমিত[১৫]। এরূপ আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীর মুক্ত চিন্তা ও কর্মস্পৃহা বাধাগ্রস্থ হয়। যার কারণে নারীর মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস গড়ে উঠে না যা আবার তাদেরকে সামাজিক বিভিন্ন কাঠামোতে পশ্চাদপদ করে রাখে। অথচ সুষম সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার পুরুষের পাশাপাশি নারীরও সামাজিক বিকাশ। এ অপরিহার্য সত্যটি আজও সম্পূর্ণরূপে সমাজের নীতিনির্ধারকদের নিকট গুরুত্ব পায়নি কিংবা তারা অনুধাবন করতে পারলেও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে সমর্থ হননি। ফলে নারী উন্নয়নে ইতোমধ্যে যতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা কাংখিত পর্যায়ের অনেক কম। তবে এটি সত্য যে, এ ব্যাপারে সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী ও সামাজিক সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে 'আশা' কর্তৃক নারী উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। 'আশা' কর্তৃক গৃহীত সামাজিক উন্নয়নের জন্য কয়েকটি কর্মসূচী নিচে উপস্থাপন করা হলো:

৫.২.২.১ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

'আশা'র ঋণদান কর্মসূচী শুধু সদস্যদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সক্ষম হচ্ছে এমন নয়। বরং সদস্যদের বিশেষ করে নারীর সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতেও সক্ষম হচ্ছে। কেননা নারী

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ গ্রহণ করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছে এবং নিজেই উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে নিজে রোজগার করতে পারার কারণে পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্বের তুলনায় অধিক অংশগ্রহণ করতে পারছে। সাপ্তাহিক সভায় গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সাথে পারস্পরিক আলোচনার ফলে নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারছে। ফলে এক সময়ের অবলা, নির্যাতিত ও ক্ষমতাহীন নারী আজ 'আশা'র ঋণ গ্রহণ করে উপার্জনক্ষম হবার কারণে স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

৫.২.২.২ ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি 'আশা' তার কার্যক্রমে গ্রুপ সদস্যদের শিক্ষার উন্নয়নেও বেশ গুরুত্ব প্রদান করে। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষায় নারীর প্রবেশাধিকার সীমিত সেখানে 'আশা' কর্তৃক নারী শিক্ষার জন্য গৃহীত কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারী শিক্ষায় পশ্চাৎপদতার জন্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার অভাবের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানও দায়ী। যেমন- ধর্মীয় প্রভাব, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, বাল্যবিবাহ, অভিভাবকের আর্থিক অসঙ্গতি, প্রচার মাধ্যমের কার্যকর ভূমিকার অভাব ইত্যাদি। গবেষণায় এসব কারণ সমূহকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হলো: প্রথমত: অনেক পল্লী এলাকায় মনে করা হয় যে, নারীর ঘরের বাহিরে বের হওয়া, ছেলেদের সঙ্গে একসাথে লেখাপড়া ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থি; দ্বিতীয়ত: সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা পল্লী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে অনেক অভিভাবক বাড়ি থেকে দূরের কোন স্কুলে তার কন্যা সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে নিরাপদ বোধ করে না; তৃতীয়ত: অনেক অভিভাবক তার কন্যা সন্তানকে বাল্যকালেই বিয়ে দিয়ে দেন; চতুর্থত: আমাদের সমাজে এখনও অনেকে পুত্র সন্তানকে সৌভাগ্যের প্রতীক এবং কন্যা সন্তানকে মনে করে দায়

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে। ফলে অনেকে কন্যা সন্তান দিয়ে সংসারের কাজ করানো এবং পুত্র সন্তানকে স্কুলে পাঠানোকে উপযুক্ত বলে মনে করেন; পঞ্চমত: শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন- রেডিও, টেলিভিশন ও খবরের কাগজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও পল্লী এলাকায় এসব প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা অনেকাংশেই সংকুচিত[১৬]। এসব কারণে নারী শিক্ষার অগ্রগতি প্রত্যাশিত মাত্রায় নয়। ফলে 'আশা' তার ঋণদান কর্মসূচির পাশাপাশি নারীর পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করে আত্মসচেতন করে গড়ে তোলার জন্য গ্রুপের সদস্যদের জন্য বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এক সপ্তাহে একটি শিক্ষা ক্লাস পরিচালনা করে শ্রেণীতে অংশগ্রহণকারীরা অন্যায়-অবিচার, হেয় প্রতিপন্নতা, দমন, অত্যাচার, সঞ্চয়, পরিবেশ-স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে[১৭]। ফলে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, দারিদ্রের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা ও তার সমাধানে সচেষ্ট হয় এবং জীবন সম্পর্কে অদৃষ্টবাদিতা দূর হয়।

৫.২.২.৩ : প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

একজন ব্যক্তির উৎপাদনশীলতার মাত্রা নির্ভর করে তার কাজের মানের দক্ষতার উপর। আর এই দক্ষতা বা কাজের মান বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণ। তাই 'আশা' তার সদস্যদের জন্য অংশগ্রহণধর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এখানে গ্রুপের সদস্যদের সমাজ ও সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া, বিপণন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে সদস্যদের মধ্যে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা ইত্যাদি ব্যাপারে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে। এছাড়াও 'আশা' সমন্বিত স্বাস্থ্য কর্মসূচী, পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মত জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৩ 'আশা'র সঞ্চয় ও ঋণ নীতি এবং কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা

'আশা' একটি অন্যতম বৃহত্তর বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা যার কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হলো নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে সমাজের হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। এরূপ ভূমিকা রাখতে 'আশা' গ্রুপ এপ্রোচ অনুসরণ করে। প্রধানতঃ যে সব নারীর মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার উপরে নয় তাদের নিয়েই 'আশা'র গ্রুপ গঠিত হয়। 'আশা'র নিজস্ব কর্মীরা দ্বারে দ্বারে ঘুরে ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সদস্য নির্বাচন করে কমিউনিটি অর্গানাইজারের মাধ্যমে গ্রুপের সদস্যারের সাপ্তাহিক সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে[১৮] ঃ

(ক) ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা;

(খ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আয়বর্ধক কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচন;

(গ) স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পুষ্টি জ্ঞান;

(ঘ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন;

(ঙ) পরিচ্ছন্নতা, টিকাদান ও স্যানিটেশন; এবং

(চ) সঞ্চয়ে সম অংশগ্রহণ।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক বেসরকারী সংস্থা, সরকারী-আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান দারিদ্র বিমোচনে পল্লী ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করছে এবং এসব কর্মসূচীর মাধ্যমে ঋণদান করে গ্রামীণ দারিদ্র বিশেষ করে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব বেসরকারী সংস্থা এবং সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত দরিদ্রের জন্য পল্লী ঋণ কর্মসূচী পর্যালোচনা করলে পল্লী ঋণ কর্মসূচীর নিম্নোক্ত কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়[১৯] :

(ক) দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান;

(খ) নির্দিষ্ট ঋণ প্রদানকারী সংস্থার ঋণ প্রত্যাশীদেরকে ৫-৩০ জন সদস্যের সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন;

(গ) সদস্যরা সপ্তাহে একবার মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট সংগঠনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা করে এবং ২-৬ মাস পর সদস্যরা ঋণ পায় এবং প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের যৌথ দায় গ্রহণ করে;

(ঘ) এক বছরের জন্য ঋণ প্রদান করা হয় এবং সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ শোধ করা হয়। তবে কিছু কিছু এনজিও মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করে;

(ঙ) সংগঠনের মাঠকর্মীরা প্রদত্ত ঋণের ব্যবহার তত্ত্বাবধান করেন;

(চ) ক্ষুদ্র ব্যবসা, খুচরা কারবার এবং পল্লী এলাকায় অন্যান্য ছোট ছোট কাজে বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেয়া হয় যাতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে তা শোধ করতে পারে;

(ছ) অধিকাংশ ঋণগ্রহীতাই (প্রায় ৯০%) নারী; এবং

(জ) ঋণ প্রদান ও তা আদায়ের জন্য পল্লী এলাকায় শাখা স্থাপন করা হয় এবং সাপ্তাহিক সভায় কিস্তির টাকা আদায় করা হয় যাতে পরিচালনা ব্যয় হ্রাস পায়।

তবে 'আশা' সঞ্চয় এবং ঋণের ক্ষেত্রে নিজস্ব মডেল অনুসরণ করে সদস্যদের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি কাংখিত আর্থিক সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নিচে 'আশা'র সঞ্চয় ও ঋণ মডেল এবং তার প্রয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হলো:

৫.২.৩.১ 'আশা'র সঞ্চয় পলিসি

সঞ্চয় করা 'আশা'র গ্রুপ সদস্যদের মৌলিক কাজ। অর্থাৎ, সাপ্তাহিক ভিত্তিতে গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যের জন্য সঞ্চয় বাধ্যতামূলক। একজন নতুন সদস্য সপ্তাহে ৫ টাকা এবং একজন পুরাতন সদস্য সপ্তাহে ১০ টাকা সঞ্চয় করে যা 'আশা'র নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ করা হয়। 'আশা'র সঞ্চয় নীতিমালা এক সময় অনমনীয়/কঠোর ছিল, কিন্তু বর্তমানে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উত্তোলনে কিছুটা নমনীয়তা আনা হয়েছে যা নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়[২০] :

(ক) সদস্যরা তাদের পুঞ্জিভূত সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের ৮০% পর্যন্ত ৫% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারে এবং গৃহীত ঋণ নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের সাথে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়;

(খ) সদস্যরা ৫০টি জেলা হেড কোয়ার্টারে ঐচ্ছিক ভিত্তিতে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারে। এই কর্মসূচী জুন, ১৯৯৭ থেকে ২০০টি শাখায় প্রবর্তন করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ থেকে এই পদ্ধতি 'আশা'র সকল শাখায় চালু হয়েছে। এসব সঞ্চয়ী হিসাবে সঞ্চয়ের ও উত্তোলনের নির্ধারিত কোন সীমা নেই।

(গ) সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর 'আশা' ৮% হারে সুদ প্রদান করে; এবং

(ঘ) 'আশা'র ঋণ কর্মসূচীর জন্য অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো সদস্যদের সঞ্চয়। 'আশা'র তহবিলের তুলনামূলকভাবে ব্যয় বহুল উৎস সদস্যদের সঞ্চয় হলেও এটা দাতাদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, স্থানীয় সম্পদের গতিশীলতা সৃষ্টিতে সহায়ক এবং 'আশা'র প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বের জন্য ১টা গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক উপাদান হিসেবে বিবেচ্য।

Dhaka University Institutional Repository

'আশা'র বিভিন্ন গ্রুপ সদস্য কর্তৃক সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত সন্তোষজনক। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রতিবছর সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচের টেবিলে বিগত কয়েক বছরের সঞ্চয়ের পরিমাণ, কর্মকান্ড পরিচালিত গ্রামের সংখ্যা, সদস্যপদ ইত্যাদি নিচের টেবিলে দেখানো হলো:

'আশা' কর্তৃক পরিচালিত ঋণদান কার্যক্রমের আওতাধীন গ্রাম, সদস্যসংখ্যা এবং সঞ্চয়

বৎসর	গ্রামের সংখ্যা	ইউনিট সংখ্যা	গ্রুপের সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		সঞ্চয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
			পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
১৯৯৫	৮,০৫২	৪২৫	২১৩	২০,৪৮৫	২,৪১৪	৪,০১,৮০৪	২৪.৫৬
১৯৯৬	৯,২৫০	৫০০	৬০০	২৮,০৮১	৭,৮৫৬	৫,৫৩,৬৭৪	৪৪.২৮
১৯৯৭	১১,৩৮২	৬৮৬	৪,৬৭৯	৩৭,৮৮৪	৫১,০৯৭	৭,৫৪,৫৩৪	৭২.২০
১৯৯৮	১৩,৫৪২	৭৩২	৫,৭৭৩	৪৪,৪২৮	৫৯,৬৭৯	৮,৩৪,৪৪০	১০৮.০১
১৯৯৯	২২,০৭৮	৮০০	৭,৬৭৯	৫১,২৯৩	৮২,৬৭২	১০,৯৬,৩১৫	১২৬.৯০
২০০০	২২,৭৪০	৮২৪	৬,৮৪২	৫৪,৫১৯	৬৮,০৩০	১১,৩৬,৯০৮	১৬০.৮৭
২০০১	২৯,২৫৩	১,০৬০	৬,৪৪০	৬৭,৮০৬	৬৭,৮১১	১৫,১১,৫৬১	১৬৯.৬২

উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৫-২০০১, 'আশা'

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় যে, 'আশা''র ইউনিট সংখ্যা, গ্রুপের সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন-১৯৯৫ সালে যেখানে ৪২৫টি ইউনিটের মোট সঞ্চয় ছিল প্রায় ২৪.৫৬ কোটি টাকা সেখানে ২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ১,০৬০ ইউনিটে প্রায় ১৬৯.৬২ কোটি টাকা।

এভাবে 'আশা' তার নিজস্ব সঞ্চয় পলিসি দ্বারা পরিচালিত হয়। এসব সঞ্চয়ই আবার সদস্যের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয় যার মাধ্যমে সদস্যরা আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জনে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, 'আশা' থেকে সুবিধা প্রাপ্ত সদস্যদের প্রায় ৯৯% নারী যারা সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর[২১]।

৫.২.৩.২ 'আশা'র ঋণ পলিসি

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা ধনী শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ যারা সাধারণত: ঋণের বিপরীতে বিভিন্ন সম্পদ বন্ধক রাখতে পারে। কিন্তু যারা দরিদ্র শ্রেণী তারা ঋণের বিপরীতে কোন সম্পদ বন্ধক রাখতে পারে না বলে তারা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে তাদেরকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। এসব অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস যেমন- গ্রামের ধনীক শ্রেণী বা মহাজন/দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তারা যে ঋণ নেয় তার সুদের হারও অনেক বেশি। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এরূপ ঋণের সুদের হার ১০০% থেকে ২০০%[২২]। অনেক সময় এসব ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ করতে না পারায় ঋণ গ্রহীতা ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পাশাপাশি শারিরীক নির্যাতনেরও স্বীকার হয়। ফলে ঋণ গ্রহীতা তার অভাবপূরণ কিংবা আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে তা তার অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন না করে বরং অনেক ক্ষেত্রে নি:স্বকরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গ্রামের অসহায় বিশেষ করে দরিদ্র নারীকে সহায়তা করার লক্ষ্য নিয়েই 'আশা' ১৯৯২ সাল থেকে ঋণদান কর্মসূচী চালু করে। আশা'র ঋণদান কর্মসূচীর লক্ষ্য আর একটু বিস্তারিত ভাবে বলতে তা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়[২৩]:

(ক) ক্রমবর্ধমান দলীয় সদস্যদের ঋণ সুবিধা প্রদান করে অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস;

(খ) আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং

Dhaka University Institutional Repository

(গ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য Cost effective way - তে বিকল্প ব্যাংকিং সুবিধার প্রবর্তন।

৫.২.৩.৩ 'আশা''র ঋণ প্রদান পদ্ধতি

'আশা'র ঋণদান পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ২০/২৫ জন মহিলার সমন্বয়ে একটি গ্রুপ গঠনের পর তাদেরকে ৩ মাস পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। সদস্যদের ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবার জন্য তাদেরকে নিয়মিত সঞ্চয় জমা দিতে হয়। এ সময় গ্রুপের সদস্যদের সচেতনতা, গ্রুপ ব্যবস্থপনা এবং নেতৃত্বের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। 'আশা'র সকল গ্রুপ সদস্যই দল গঠনের ৬ মাসের মধ্যে ঋণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়। তবে কোন সদস্য যে পরিমাণ ঋণ নিবে তার অন্তত: ১০% সঞ্চয় 'আশা'য় জমা থাকতে হবে। একজন সদস্য তার ঋণের সমুদয় কিস্তি পরিশোধের ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় ঋণ নিতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, 'আশা''র ঋণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'আশা''র ১ জন কর্মী যিনি মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি অর্গানাইজার হিসেবে ২০/২৫ জন সদস্য বিশিষ্ট ১৮টি গ্রুপের দায়িত্বে থাকেন এবং প্রতি ৩/৪ জন কমিউনিটি অর্গানাইজারের দায়িত্বে থাকেন একজন ইউনিট ম্যানেজার।

৫.২.৩.৪ 'আশা' প্রদত্ত ঋণের ধরন ও পরিমাণ

'আশা' তার সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান করে থাকে। এ সব ঋণ সমূহ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়[২৪] :

(ক) **সাধারণ ঋণ:** 'আশা' সাধারণত: এ ধরনের ঋণই বেশি দিয়ে থাকে এবং সকল সদস্যই একটা নির্দিষ্ট সময় পর এ ঋণের যোগ্য বিবেচিত হয়। এ ঋণের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত।

(খ) **উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ :** এ ধরনের ঋণ প্রতি ইউনিটে মাত্র ২টি পুরুষ গ্রুপে পরীক্ষামূলকভাবে প্রদান করা হয় এবং ইউনিট ম্যানেজারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকেন। এ ঋণের পরিমাণ, ৮,০০০ টাকা থেকে ১৮,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়।

(গ) **পয়ঃ নিষ্কাশন ঋণ :** পল্লী এলাকার অস্বাস্থ্যকর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে 'আশা'র প্রত্যেক সদস্য দ্বিতীয় বর্ষে মাত্র ৫% সুদে ৬০০ টাকা ঋণ নিতে বাধ্য থাকে যা ৪৫ টি কিস্তিতে এক বছরে পরিশোধ করতে হয়।

(ঘ) **সঞ্চয় ঋণঃ** 'আশা'র সদস্যরা ৫% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে তার সঞ্চয়ের ৮০% পর্যন্ত এ ঋণ নিতে পারে যা সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

(ঙ) **দুর্যোগ ঋণঃ** প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে 'আশা' তার সদস্যরের ২ বছর মেয়াদের জন্য বিনা সুদে ৫০০ টাকা এ ধরনের ঋণ দেয় এবং এই দুর্যোগকালীন সময়ে সাধারণ ঋণ আদায়ও ১৫-৩০ দিনের জন্য আদায় স্থগিত রাখে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে 'আশা'র সদস্যরা পয়:নিষ্কাশন ছাড়া যে কোন এক ধরনের ঋণ নিতে পারে এবং তার সকল কিস্তি পরিশোধের পর পুনরায় ঋণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৫.২.৩.৫ ঋণ ব্যবস্থাপনা

কম ব্যয় এবং দক্ষভাবে ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করা 'আশা'র অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য একজন ইউনিট ব্যবস্থাপকের অধীনে ৩/৪ জন কমিউনিটি অর্গানাইজার থাকে এবং একজন কমিউনিটি অর্গানাইজারের অধীনে ২০/২৫ সদস্য বিশিষ্ট ১৮টি গ্রুপ থাকে। প্রতি গ্রুপের সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ সঞ্চয় সংগ্রহ, ঋণের সাপ্তাহিক কিস্তি আদায় করতে কমিউনিটি

Dhaka University Institutional Repository

অর্গানাইজারকে সহায়তা করে। ইউনিট ব্যবস্থাপক ঋণের আবেদন প্রাপ্তির পর ২ সপ্তাহের মধ্যে তা প্রক্রিয়াকরণ, চূড়ান্তকরণ এবং ঋণ অবমুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য যে, দৈনন্দিন আদায়কৃত অর্থও ঐ দিনের ঋণ অবমুক্তকরণে ব্যবহৃত হয় এবং কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকলে তা ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হয়। ঋণ খতিয়ান, সাধারণ খতিয়ান এবং নগদান বহি ইউনিট অফিসে সংরক্ষণ করা হয়।

৫.২.৩.৬ ঋণের সুদের হার

'আশা' প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণের সুদের হারেও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন - পয়:নিষ্কাশন ঋণে ৫%, সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণে ৫% এবং অন্যান্য ঋণে ১২.৫% সুদ দিতে হয়। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, 'আশা' এক বছরের জন্য ঋণ প্রদান করলেও ঋণগ্রহীতাকে তা সুদসহ ৪৫টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় এবং সুদের হার ১২.৫% বলা হলেও প্রকৃত সুদের হার প্রায় ২৪%[২৫]। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একজন সদস্য এককালীন ১,০০০ টাকা ঋণ নিলে তার ১২.৫% সুদসহ প্রতি সপ্তাহে ২৫ টাকা করে ৪৫টি কিস্তিতে মোট ১,১২৫ টাকা পরিশোধ করতে হয়। প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট টাকা শোধ করলেও গৃহীত ঋণের পুরো টাকার উপর সারা বছরের জন্য সুদ দিতে হয়। এছাড়া গৃহীত ঋণের উপর ০.৩% হারে সার্ভিস চার্জ দিতে হয়।

৫.২.৩.৭ 'আশা''র ঋণদান ও ঋণ আদায়

'আশা' ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঋণদান কার্যক্রম পুরো মাত্রায় শুরু হয় ১৯৯২ সাল থেকে। এরপর থেকে 'আশা'র ঋণদান ও আদায় কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষজনক। 'আশা' প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ঋণ গ্রহীতার মাঝে ঋণ বিতরণ করে তাদেরকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক

কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। নিচে বিগত ৫ বছরের মোট বিতরণকৃত ঋণ, ঋণের সংখ্যা ও ঋণের গড় নিচের টেবিলে দেখানো হলো:

'আশা' কর্তৃক অবমুক্তকৃত ঋণ, ঋণের সংখ্যা, ঋণের গড় আকার ও আদায়ের হারঃ

বৎসর	অবমুক্তকৃত ঋণ	ঋণের সংখ্যা	ঋণের গড় আকার	ঋণ আদায়ের শতকরা হার
১৯৯৭	২৯৭,১৯,৪৯,০০০	৭,২২,৪১১	৪,৩১৪	৯৯.৯৩%
১৯৯৮	৪৩২,৮১,০১,০০০	৮,৬৪,১৫৫	৫,০০৮	৯৯.৯৬%
১৯৯৯	৬৬১,৯৩,২৬,০০০	১১,৪১,৫২৬	৫,৭৯৯	৯৯.৯৩%
২০০০	৭৭৮,২৩,৩৫,০০০	১১,৯৩,৩৩২	৬,৫২২	৯৯.৯০%
২০০১	৯৯৬,৬৬,৫৩,০০০	১৪,৭৫,৬৭৫	৬,৭৫৪	৯৯.৯৩%

উৎস : বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৭-২০০১, 'আশা'

পূর্ববর্তী স্মারণীতে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে 'আশা' ৭,২২,৪১১টি ঋণের বিপরীতে ২৯৭ কোটি টাকারও অধিক ঋণ বিতরণ করে এবং ঋণের গড় 'আশা'র ছিল ৪,৩১৪ টাকা এবং এই পরিমাণ ও সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ১৪,৭৫,৬৭৫টি ঋণের বিপরীতে অবমুক্তকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৯৯৬.৬৭ কোটি টাকা এবং প্রতিটি ঋণের গড় 'আশা'র ছিল ৬,৭৫৪ টাকা। স্মারণী থেকে এটাও স্পষ্ট যে, প্রতিবছর 'আশা'র বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, সংখ্যা ও গড় 'আশা'র প্রতিটিই উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, 'আশা' কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের হারও অত্যন্ত সন্তোষজনক। প্রদত্ত স্মারণী থেকে দেখা যায় যে, প্রতিবছরই ঋণ আদায়ের হার প্রায় ১০০% যা দেশের অন্য যে কোন ঋণ আদায়ের হার অপেক্ষা বেশি।

৫.২.৪ 'আশা'র আয়-ব্যয়

নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে 'আশা' যে সব কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে তার পিছনে বিভিন্ন খাতে আয় ও ব্যয় হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে 'আশা'র মূল লক্ষ্য হলো প্রদত্ত সেবা বাবদ বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

খাত থেকে প্রাপ্ত আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করা। 'আশা'র আয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হলো সার্ভিস চার্জ। এছাড়া অন্যান্য খাতগুলো হলো ফিস, ব্যাংক সুদ ইত্যাদি। নিচের টেবিলে 'আশা'র বিগত কয়েক বছরের আয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

'আশা'র আয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্রঃ

(মিলিয়ন টাকায়)

আয়ের খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১
১. সার্ভিস চার্জ	১৭৯.০৮	২৭৭.৩৫	৪৭০.২৯	৭১০.১৮	৯৯৬.৫৮	১,২৮৭.৭৭
২. ভর্তি ফিস	২.৭১	৭.৬৫	৭.৬৫	৬.৪০	৩.৪৫	৬.৪৪
৩. ব্যাংক সুদ	৫.০৭	১৩.৩১	২০.২৮	৪০.৬১	৬১.৫৯	৪৫.৫১
৪. অন্যান্য	৯.২০	১১.৬৯	১০.১৪	১৫.১৪	১২.০৫	৬.৯৯
মোট	১৯৬.০৬	৩১০.০০	৫০৮.৩৬	৭৭২.৩৩	১,০৭৩.৬৭	১,৩৪৬.৭১

উৎস : বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৬-২০০১, 'আশা'

'আশা' যেমন- বিভিন্ন খাত থেকে আয় অর্জন করে থাকে তেমনি বিভিন্ন খাতে ব্যয়ও হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বেতন ও ভাতাদি, দাপ্তরিক ব্যয়, তহবিল খরচ, অবচয় এবং Loan loss provision ইত্যাদি। নিচের টেবিলে 'আশা'র বিগত কয়েক বছরের ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো[২৬] :

আশা'র বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যয়ের খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১
১. বেতন ও ভাতাদি	৯৭.৪৯	১২৪.৯৫	১৭৩.৮৯	২২১.৬৭	২৭৮.৯৮	৩৪৬.৯৫
২. দাপ্তরিক ব্যয়	২২.৩৫	৩১.৬৫	৩৮.৬৬	৪৪.২৭	৪৮.৮৬	৬১.৩০
৩. অবচয়	৩.৪৫	৪.২৬	৫.৮০	৬.৩১	৬.৮৪	৪.৯৯
৪. তহবিল খরচ	৪৬.০০	৯৬.০০	১৬৭.০০	২৪৪.০০	৩৭৩.০০	৪৪২.২২
৫. Loan Loss Provision	৯.১২	১৪.৭৪	৪৩.২৮	৬৬.১৯	৭৭.৮২	৯৯.৬৭
মোট	১৭৮.৪১	২৭১.৬০	৪২৮.৬৩	৫৮২.৪১	৭৮৫.৫০	৯৫৫.১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রদত্ত টেবিল দু'টির তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে 'আশা'র বিভিন্ন খাতে আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৯৬.০৬ মিলিয়ন টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৭৮.৪১ মিলিয়ন টাকা যা ২০০১ গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে প্রায় ১,৩৪৬.৭১ মিলিয়ন এবং ৯৯৫.১৩ মিলিয়ন টাকা। ফলে বলা যায় যে, 'আশা'র পরিচালনার আয় থেকে পরিচালনা ব্যয় মিটিয়েও উদ্বৃত্ত আয় অর্জনে সক্ষম হচ্ছে এবং এই আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫.২.৪ 'আশা'র সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচীর পারফরমেন্স

কোন কর্মসূচীর সফলতা নির্ণয়ের কতিপয় নির্দেশক (Indicator) থাকে যার সাথে তুলনা করে বলা যায় যে, কর্মসূচী কতটা সফল বা ব্যর্থ। যেমন- আমরা একটা কারবার প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ণয় করি তার মুনাফার পরিমাণ কত এবং তা মোট সম্পদের কতভাগ, স্থায়ী সম্পদ, চলতি সম্পদ, দায় দেনা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে। ঠিক তেমনি 'আশা'র সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচী কতটা সফল বা ব্যর্থ তা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে কতিপয় নির্দেশক ব্যবহার করে নির্ণয় করা যায়। এরূপ কতিপয় নির্দেশকের ভিত্তিতে 'আশা'র সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচীর পারফরমেন্স নিচের টেবিলে দেখানো হলো-

'আশা'র সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচীর পারফরমেন্স

খাত	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১
1. Return on Total Assets (%)	১৯.৭৫	২০.৮৪	২১.১৭	২৪.০৩	২৫.০১
2. Operational Self-Sufficiency (%)	১১২.৫৫	১১৭.৬১	১৩২.৬২	১৩৬.৬০	১৪১.০০
3. Financial Self-Sufficiency (%)	১০৩.০৩	১১০.৩৫	১১৮.২৫	১২৪.৯০	১২৮.০৭
4. Cost Per Unit of Money Lend (%)	০.০৫৫	০.০৫০	০.০৪১	০.০৪৩	০.০৪১
5. Cost Per Loan (Tk)	২২৭.৬৬	২৬৫.৫৬	২৩৮.৪৭	২৮০.৪৬	২৮০.০৩
6. ঋণ কর্মকর্তা প্রতি ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	২৩৭.৭১	২৮৭.১৫	৩২৫.২৩	৩২৩.৪১	৩৪৫.১১
7. Portfolio per Credit Officer	৬২৪,০৫২	৮০৯,৯৫৪	১১,০৮,০৮৩	১১,৪১,৯০৭	১৩,০৭,১৩৩

উৎসঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৭-২০০১, 'আশা'

Dhaka University Institutional Repository

প্রদত্ত টেবিল থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে 'আশা'র মোট সম্পদের উপর আয়/মুনাফার হার ছিল ১৯.৭৫% যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫.০১%। ঠিক তেমনি Operational এবং Financial Self-Sufficiency এর হারও ১৯৯৭ সালের ১১২.৫৫% ও ১০৩.০৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১৪১% এবং ১২৮.০৭% এ পৌঁছেছে যা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে আশাব্যঞ্জক। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের খরচের দিক অর্থ্যাৎ ঋণ প্রদান বাবদ প্রতি টাকায় ব্যয়ের পরিমাণও ০.০৫৫ টাকা থেকে ০.০৪১ টাকায় নেমেছে যা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার পরিচায়ক। তেমনি প্রতি ঋণ কর্মকর্তার গড় কর্ম পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করেছে। তবে এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, এ সবকিছুই প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের মাপকাঠি। কিন্তু 'আশা'র মূল যে লক্ষ্য অর্থ্যাৎ দারিদ্র পীড়িত অসহায় লোকদের বিশেষ করে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এ কর্মসূচী কতটা সফল যে সম্পর্কে বিবেচনা প্রসূত মন্তব্য করার জন্য প্রয়োজন আরো বিস্তারিত গবেষণার। কেননা সময়ের স্বল্পতা, আর্থিক অনুদান না পাওয়া এবং বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য থেকে অনুরূপ বিস্তারিত গবেষণা পরিচালানর দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, সঞ্চয়ের পরিমাণ ও ঋণ পরিশোধের হার ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ সাধারণ মন্তব্য করা যায় যে, 'আশা'র ঋণদান ও সঞ্চয় কর্মসূচী ইতিবাচক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো অধিক মাত্রায় বিস্তৃতি লাভে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা যায়।

৫.৩ আশা কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন

'আশা' প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী উন্নয়নের জন্য কাজ করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'আশা' নারী উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য সংগঠনটি যে বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করছে তা হলো নারীর সচেতনতা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আয় অর্জনে সহায়তা করা যাতে নারী আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারে। কেননা

Dhaka University Institutional Repository

নারী উপার্জনক্ষম হলেই অনেক সমস্যার সমাধান হবে এবং তার অবশিষ্ট সমস্যা সমাধানেও সচেষ্ট হবে। এজন্য নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে তাদের মূলধনের চাহিদা মিটাতে 'আশা' তার সদস্যদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং নিজস্ব সঞ্চয় থেকেই ঋণদান কর্মসূচী চালু করে ১৯৯২ সাল থেকে। এই ক্ষুদ্র ঋণ কীভাবে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়তা করে সে সম্পর্কে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন "If we are looking for one single action which will eanble the poor to overcome their poverty, I would go for credit. Money is power. I have been arguing that credit should be accepted as a human right. If we can come up with a system which allows everybody access to credit while ensuring excellent repayment- I can guarantee you poverty will not last long.[২৭] উক্তিটির মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, দরিদ্র লোকের দারিদ্র বিমোচনের জন্য একক কোন পন্থার করা বিবেচনা করা হলে তা হবে ঋণ। অর্থ্যাৎ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে পারলে এবং তাদের প্রাপ্ত ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করতে পারলে তা যেমন একদিকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ নিশ্চিত করবে তেমনি তা ঋণগ্রহীতার দারিদ্র দূরীকরণে সহায়ক হবে। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, দারিদ্র কোন একক উপাদানের ফল নয়। বরং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক জটিল বিষয়ের অনিবার্য ফল। তবে কার্যক্ষম ও দক্ষ আর্থিক অনুদান বা সহযোগিতা ও তার যথাযথ ব্যবহার এ দারিদ্র হ্রাসকরণে বিশেষ সহায়তা করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানকারী সংস্থার কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই ঋণ কার্যক্রমের আওতা বহির্ভূত থাকে। ফলে তাদেরকে গ্রামের মহাজন শ্রেণী থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে দৈনন্দিন বিভিন্ন প্রয়োজন বা কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে হয়। তবে বাস্তবতা হলো এই যে, এরূপ ঋণ কোন আয় অর্জনকারী প্রকল্পে বিনিয়োগ করার

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তে প্রত্যাহিক অন্ন বস্ত্রের সংস্থানেই বেশি ব্যবহার হয়। ফলে ঋণগ্রহীতা এক সময় এ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় যার অনিবার্য ফলস্বরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিস্বঃকরণ প্রক্রিয়া আরো তরান্বিত হয়। এরূপ অনাকাংখিত বাস্তবতার শিকার ফলে এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অর্থাৎ, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যেই অন্যান্য এনজিও'র ন্যায় 'আশা' তার ঋণদান কার্যক্রম চালু করে এবং ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ Microfinance Institution (MFI) হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেছে। বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে দক্ষভাবে ক্ষুদ্রঋণ সেবা সরবরাহের জন্য কোন কোন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষক 'আশা'কে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দক্ষ ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বাংলাদেশের হেনরী ফোর্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৮] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, 'আশা' অন্যান্য এনজিও'র ন্যায় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করলেও অন্যান্য এনজিও থেকে 'আশা'র কতিপয় স্বতন্ত্র লক্ষণীয়। যেমন- স্বল্প ব্যয়ে ঋণ, সুনির্ধারিত বিধি; দক্ষ মডেল, উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে 'আশা' সুবিধাবঞ্চিত ব্যাপক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের উন্নত আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। 'আশা' প্রাথমিক পর্যায়ে দাতাদের অনুদান নির্ভর ছিল এবং এর কর্মকান্ড ছিল সীমিত পর্যায়ে । কালক্রমে 'আশা' আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর জোর দেয় এবং এই সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত মূলধনই ঋনদাণ কার্যক্রমে ব্যবহার শুরু করে। এ পর্যায়ে 'আশা'র কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য দিক হলো তার সকল সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে পুরুষের পরিবর্তে নারীকেন্দ্রিক সমিতি গঠনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তুলনামূলক স্বল্প সময়ে দক্ষতার সহিত ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে নিম্ন ব্যয়ে ঋণদান করে অর্থনৈতিক স্বয়;ম্ভরতা

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনে এবং প্রবৃদ্ধি স্তরে 'আশা' স্বেচ্ছায় সঞ্চয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এরূপ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে 'আশা' নিম্নোক্ত সাংগঠনিক আদর্শের প্রতি গুরুত্ব প্রদান[২৯] :

ক) সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান;

খ) মৌলিক স্ব-প্রণোদিত বিনিয়োগ সেবা প্রদান; এবং

গ) সহজ, কার্যক্ষম এবং অনমনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে Cost-effective ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এবং সীমিত বিনিয়োগ সেবা প্রদান;

ঘ) বিলম্বে ঋণের কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে Zero-tolerance চর্চা করা।

'আশা'র অনুসৃত মডেলে মনে করা হয় যে, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক Cost-effective পন্থায় ঋণদান করা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব। কেননা সেবাদানকারীর অদক্ষতার দায় কখনই দরিদ্র ঋণগ্রহীতা বহন করতে পারে না। এই নীতিতে 'আশা' তার ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং স্বল্পতম সময়ে আশা ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে এই ঋণদান কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। নিচের টেবিলের 'আশা' কর্তৃক সংগৃহীত সঞ্চয়, বিতরণকৃত ঋণ এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা নিচের টেবিলে দেখানো হলো:

'আশা' কর্তৃক সংগৃহীত সঞ্চয়, বিতরণকৃত ঋণ, সদস্য সংখ্যা, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা :

(মিলিয়ন টাকায়)।

	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১
সঞ্চয়ের পরিমাণ	৭২২.০৫	১,০৮০.১১	১,২৬৯.০০	১,৬০৮.৬৭	১,৬৯৬.১৬
বিতরণকৃত ঋণ	২,৯৭১.৯৫	৪,৩২৮.১০	৬,৬১৯.৩৩	৭,৭৮২.৩৪	৯,৯৬৬.৬৫
সদস্য সংখ্যা	৮,০৫,৬৩১	৮,৯৪,১১৯	১১,৭৮,৯৮৭	১২,০৪,৯০৩	১৫,৭৯,৩৭২
ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	৬,৩৫,৩৯৯	৭,৮৬,৪৯২	১০,৮৪,৩১৮	১১,২৮,৬৯৩	১৪,১৪,৯৩১

উৎসঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৭-২০০১, আশা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদত্ত টেবিল থেকে দেখা যায় যে, 'আশা' ১৯৯৭ সালে ৬,৩৫,৩৯৯ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২,৯৭১.৯৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করেছে এবং সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৭২২.০৫ মিলিয়ন টাকা যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে দাঁড়ায় ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১৪,১৪,৯৩১ জনে এবং বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ও সংগৃহীত সঞ্চয় দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯,৯৬৬.৬৫ মিলিয়ন টাকা এবং ১,৬৯৬.১৬ মিলিয়ন টাকা। অনুরূপভাবে, 'আশা'র সদস্য সংখ্যাও ১৯৯৭ সালের ৮,০৫,৬৩১ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে পৌঁছে ১৫,৭৯,৩৭২ জনে। উল্লেখ্য যে, 'আশা'র বিভিন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সংগঠনটি শুধু ঋণ বিতরণেই সাফল্য অর্জন করেনি বরং ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও সফলতা অর্জন করেছে। অর্থ্যাৎ ঋণ আদায়ের হার প্রায় ১০০%। এভাবে 'আশা'র কার্যক্রম উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি পর্যায়ে 'আশা'র কার্যক্রমের উপর এক বহিঃমূল্যায়নে (external evaluation) যে সব মন্তব্য করা হয়েছে তার কতিপয় উল্লেখযোগ্য হলো[৩০] ঃ

(ক) আয় বর্ধকমূলক প্রকল্পে ঋণের অর্থ ব্যবহার করে পরিবারসমূহ স্বচ্ছলতা অর্জন করেছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে;

(খ) নারী তাদের পুরুষ অংশীদারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও পরিবার বা সমাজ কর্তৃক যে কোন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পেরেছে;

(গ) অনেকে পর্যাপ্ত মূলধন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে যা তাদের নিকট ভবিষ্যতে তহবিলের প্রয়োজনীয়তা পূরণে পুনরায় ঋণের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণে সহায়তা করবে;

(ঘ) নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকার কারণে পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে;

(ঙ) গ্রামীণ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ঋণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে;

(চ) ঋণগ্রহীতার গড়ে ৪০% আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে;

(ছ) ঋণ আদায়ের হার প্রকৃতপক্ষে ১০০%;

(জ) ঋণ আদায়ের হারের ভিত্তিতে 'আশা' তার মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ড থেকে সংগঠনের জন্য ২৬.৩% আয় অর্জনে সক্ষম হয়েছে যা আশা'র ব্রেকইভেন সার্ভিস চার্জ ২৪.৩% থেকে ২% অধিক। অর্থাৎ 'আশা' ২% মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ঋণ ও সঞ্চয় সেবার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য 'আশা'র মডেল ডিজাইন করা হয়েছে। 'আশা' মূলত: একটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ করে এবং এর সদস্যদের সঞ্চয়ের অবাধ সুযোগ প্রদান করে। 'আশা'র সদস্যরা সদস্যপদ গ্রহণের ৪ সপ্তাহ পর ঋণ পাবার যোগ্য বরে বিবেচিত হয় এবং একসংগে একটিমাত্র ঋণ নিতে পারে। তবে একটি ঋণের সকল কিস্তি পরিশোধের পর পুনরায় ঋণ নিতে পারে। ঋণের অর্থ সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ঋণ গ্রহণের পর প্রথম দুই সপ্তাহ গ্রেস পিরিয়ড পায়। অর্থ্যাৎ ঋণগ্রহীতা চাইলে ২ সপ্তাহ পর থেকে কিস্তি পরিশোধ শুরু করতে পারে। তবে 'আশা'র ঋণ নীতি অত্যন্ত অনমনীয় বলে অনেকেই এর সমালোচনা করে থাকেন। এই প্রেক্ষিতে 'আশা'র বক্তব্য হচ্ছে এরূপ যে, 'আশা' কিছুসংখ্যক লোককে নমনীয় ও ব্যাপক সেবা প্রদানের পরিবর্তে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে অনমনীয় সেবা প্রদান করে থাকে। এতে 'আশা'র হিসাব সংরক্ষণ ও ঋণের খরচ হ্রাস করা সহজ হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে 'আশা' অতিদ্রুত ব্যাপক জনগোষ্ঠী ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় আনতে পেরেছে এবং সেবার মানও নিম্নগামী হয়নি। ২০০১ সালে আশা ২৯,২৫৩টি গ্রামে ১,০৬০ ইউনিটের মাধ্যমে মোট ১৪,১৪,৯৩১ জন ঋণগ্রহীতাকে ১,৬৯৬.১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণদান করেছে যার আদায়ের হার ৯৯.৯৩%[৩১] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, 'আশা'র সার্বিক কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যয় সাশ্রয়ী বা Cost-effective. আর এটা সম্ভব হয়েছে 'আশা'র সাংগঠনিক কাঠামো, পরিচালন পদ্ধতি, সাংগঠনিক সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

এবং সর্বোপরি সংগঠনের ব্যবস্থাপনার শক্তিশালী প্রতিশ্রুতির জন্য যা থেকে অন্যান্য সংগঠনের জন্যও অনুসরণীয় হতে পারে। উল্লেখ্য যে, 'আশা'র নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়নে 'আশা' কর্তৃক সরবরাহকৃত ঋণ, কতটা এলাকায় তার কর্মকান্ড সম্প্রসারিত করতে পেরেছে, কতজন সদস্য ও কতজন ঋণগ্রহীতাকে ঋণদান করেছে এবং এসব ঋণের আদায়ের হার ইত্যাদির ভিত্তিতে আশা'র কার্যক্রমের উপর মন্তব্য করা হয়েছে। তবে নারীর উন্নয়ন শুধু এসব বিষয়ের উপরই নির্ভর করে না; বরং আরো অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন- এসব কার্যক্রমের ফলে নারী কতটা সচেতন হয়েছে, শিক্ষার প্রসার কতটা হয়েছে, পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ কতটা বেড়েছে, স্বাস্থ্যের মান, খাদ্য গ্রহণের মাত্রা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সাথে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট। তবে এতটুকু বলা যায় যে, একজন ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণ করে তখনই ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয় যখন ঋণকৃত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, 'আশা'র ঋণদান কার্যক্রম সে লক্ষ্য অর্জনে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে তা ঋণ আদায়ের হার ও ঋণগ্রহীতার উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি থেকেই ধারণা করা যায়। আর ঋণগ্রহণকারী যদি সঠিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হয় তবে তার প্রভাব তার জীবনের আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই পড়বে এটা অনেকটা নিশ্চিত বিষয়।

৫.৪ এডাব, জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটি এবং আশা'র সম্পর্ক

এডাব বা জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটির সাথে আশা'র সম্পর্ক কি তা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়:

৫.৪.১ এডাব এর উৎপত্তি ও প্রসার

দি এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীজ ইন বাংলাদেশ (এডাব) প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে দি এসোসিয়েশন অব ভলান্টারি এজেন্সীজ ইন বাংলাদেশ (এডাব) নামে। এডাব

Dhaka University Institutional Repository

যদিও ১৯৭৩ সালের ১০ ডিসেম্বর ৯টি ভলান্টারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয় কিন্তু এর আনুষ্ঠানিক গঠনের তারিখ হিসেবে স্বীকৃত ১ জানুয়ারি, ১৯৭৪। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এনজিও সংগঠনগুলোর মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান যা প্রধানতঃ করা হতো: (ক) মাসিক জার্নাল প্রকাশ, এডাব নিউজ যা প্রাথমিকভাবে খবরের কাগজ এবং পরবর্তীতে ম্যাগাজিন আকারে প্রকাশিত হয়; এবং (খ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত বিষয়ের উপর মাসিক সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে। এছাড়াও এডাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রিলিফ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত এনজিও'র কর্মকান্ড সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতো। ১৯৭৬ সালে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এডাব এর ভূমিকা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ছাড়াও কৃষি উন্নয়নের মধ্যে নির্দিষ্ট থাকা উচিত এবং এর নাম পরিবর্তন করে এগ্রিকালাচারাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীজ ইন বাংলাদেশ (এডাব) করা হয়।[৩২] এডাব প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের সাথে উন্নয়ণ সংক্রান্ত সাধারণ (Common) পলিসি নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে এ সংগঠনটি হবে এনজিওদের প্রতিনিধি বা সম্মিলিত কন্ঠস্বর। এরপর ১৯৮৩ সালে এ সংগঠনটির নাম পরিবর্তন হয় এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীজ ইন বাংলাদেশ (এডাব) হিসেবে। প্রথম দিকে বেশ কয়েক বছর এডাবের পলিসি গ্রহণ এবং বাস্তবমুখী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণে বৈদেশিক বিভিন্ন সংস্থা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে থাকে। ১৯৭৮ সালে এডাবের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এডাব স্থানীয় নেতৃত্বের অধীনে চলে আসে। এরপর এডাব ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয় ও বাস্তবায়ন করে যার মূল লক্ষ্য ছিল সদস্য সংস্থাকে ও অন্যান্য এনজিওকে আরো দক্ষভাবে সেবা প্রদান করা যায়। সংক্ষেপে এসব কর্মসূচীর লক্ষ্য নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়:[৩৩]

(ক) বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজন বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন এনজিও বিশেষ করে ছোট ছোট এনজিও কর্তৃক এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তাদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন ও তার প্রয়োগে সহায়তা করা; এবং

(খ) দেশব্যাপী বিভিন্ন এনজিওকে প্রদত্ত এডাবের সেবা অধিক মাত্রায় বিকেন্দ্রীকরণ।

৫.৪.২ এডাবের উদ্দেশ্য

সদস্য এনজিও'র মধ্যে দক্ষভাবে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এডাব বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে এনজিও'র কর্মকান্ডে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজন বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র নারী-পুরুষের এবং সরকারী বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রতি দ্রুত সাড়া প্রদানের করা যায় সে ব্যাপারে এনজিওদের তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এনজিওদের সহায়তা করাই এডাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এডাবের উদ্দেশ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়[৩৪] :

(ক) প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং মূল্যায়ন। প্রোগ্রাম কনসালটেন্সী, সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন, দাতাদের সাথে সংযোগ রক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রয়োজন ভিত্তিক (need based) সেবাদানের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে এনজিও'র উন্নয়ন;

(খ) জার্নাল, সেমিনার, ওয়ার্কসপ, এবং লাইব্রেরী সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যের আদান-প্রদান করা;

(গ) সরকারের নিকট এনজিওদের প্রতিনিধিত্ব করা, এনজিওদের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে এমন সব আইন-কানুন পর্যালোচনা করা এবং তা সদস্যদের মধ্যে আদান-প্রদান করা এবং সদস্য এনজিওদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে থানা বা আরো তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন;

(ঘ) সদস্য ফি, অনুদান এবং অভ্যন্তরীণ আয় সৃষ্টিকারী কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্থানীয় উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৩ এডাব গৃহীত কর্মসূচী

এডাবের প্রাথমিক কর্মকান্ড সেমিনার অনুষ্ঠান, নিউজ লেটার ও জার্নাল প্রকাশ এর মাধ্যমে এনজিও সমূহের কে কি করছে, কোথায় এবং কিভাবে করছে ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যার মূল লক্ষ্য ছিল ভুল-ত্রুটির পুনরাবৃত্তি পরিহার করা যায়। কিন্তু এক পর্যায় দেখা গেল যে, এসব সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এর মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান কর্মসূচীতে ঢাকায় অবস্থিত এনজিওসমূহ অংশগ্রহণ করতে পারলেও ঢাকার বাইরে অবস্থিত ব্যাপক সংখ্যক এনজিও অংশগ্রহণ করতে পারছেনা। ফলে দেশব্যাপী কর্মরত সকল এনজিওকে উপরিউক্ত সেবা কিভাবে প্রদান করা যায় সে ব্যাপারে এডাবের সদস্যরা নতুন কৌশল বের করতে সচেষ্ট হন। এ লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে, সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় যে, এনজিওসমূহের স্বার্থে এডাবের কর্মকান্ড আরো বিস্তৃত করা হবে যাতে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এনজিওসমূহের উন্নয়নে কাজ করা যায়। এরূপ সিদ্ধান্তক্রমে এডাবের কর্মকান্ড বিস্তৃত করা শুরু হয় এবং এডাবের বিশেষ সেল এর মাধ্যমে বেশকিছু কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এসব কর্মসূচীর আবার অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয় যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয় স্থানীয় এনজিওসমূহের উন্নয়ন, বিশেষ সেলের অধীনে অন্যান্য প্রোগ্রামসমূহ ছিল: প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মূল্যায়ণ ও ডকুমেন্টেশন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনা, তথ্যের আদান-প্রদান এবং প্রকাশনা এবং লাইব্রেরী[৩৫]।

এডাবের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (১৯৮৮পর্যন্ত) ১২ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি যার একজন সভাপতি, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং এনজিও'র প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত ৯ সদস্যের সমন্বয়ে সংগঠিত। তবে এসব প্রতিনিধি এডাবের সদস্য এনজিওদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হতে হয়। যে কোন অব্যবসায়ী, অরাজনৈতিক এবং ভলান্টারী সংস্থা যা সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিবন্ধনকৃত এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত তারা এডাবের সদস্য হতে পারে। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এডাবে সদস্য ছিল ১৫৬[৩৬] ।

১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এডাবের কর্মসূচী, উদ্দেশ্য এবং কৌশল নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সীমিত ছিল-

(ক) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় এনজিও'র উন্নয়ন;

(খ) এনজিও'র ব্যবস্থাপকীয় ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এডাবের নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেলের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন এনজিও'র বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদান;

(গ) এনজিও সমূহকে ভিত্তিলাইন (Base-line) জরিপ এবং মূল্যায়ন কর্মকান্ডে সহায়তা করা;

(ঘ) এডাবের নিজস্ব এডাব নিউজ ও এডাব সংবাদ, কারিগরী প্রতিবেদন, মেমো, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু সম্পর্কিত তথ্যের আদান-প্রদান;

(ঙ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদান;

(চ) দুর্যোগ মোকাবেলা ইউনিট এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা, দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সমন্বয় ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সরবরাহ করে তা মোকাবেলার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শদান;

(ছ) এনজিও ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী সেবা প্রদান করা;

Dhaka University Institutional Repository

(জ) দাতা সংস্থাদের সেবা প্রদান; এবং

(ঝ) অফিসভিত্তিক বিভিন্ন সেবা যেমন-ন্যূনতম ব্যয়ে সাইক্লোস্টাইলিং, ফটোকপি,, টেলেক্স সুবিধা প্রদান করা ইত্যাদি।

৫.৪.৪ আশা এবং এডাবের সম্পর্ক

দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর কাংখিত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে এসোসিয়েশন ফর সোশাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) গঠনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং এটি ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি এনজিও হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আশা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এনজিওদের বৃহৎ সংগঠন এডাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে এডাব তেমন কোন কার্যকরী ভূমিকা এবং নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি বলে আশা এর থেকে বেরিয়ে আসে।

৫.৪.৫ আশা এবং জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটি

২০০২ সালের ২৬ জুলাই গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিএইচএ মিলনায়তনে প্রথম জাতীয় এনজিও কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে এনজিও প্রতিনিধিদের বৃহৎ সংগঠন এডাব ভেঙ্গে যায় এবং এনজিওদের স্বার্থ সমুন্নত রাখা ও এনজিওদের সমস্যা নিরসনে আলোচনা ও সমন্বয় জোরদার করতে অন্তবর্তীকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়।[৩৭] আশা বর্তমানে জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটির সাথে একাত্ম হয়ে কাজে করছে। জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটির মূল দায়িত্ব নিম্নরূপ-

(ক) এনজিওদের সমস্যার নিরিখে সরকারের সাথে যোগাযোগ আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এর নিরসনের পদক্ষেপ নেয়া;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) স্থানীয় ও ছোট এনজিওদের অর্থায়ন সংকট ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পদ সমবেশীকরণ, সহযোগীতা সম্প্রসারণ ও পারস্পরিক সমন্বয় সাধন;

(গ) এনজিও-এনজিও সমন্বয় ও ঐক্য জোরদার করা এবং এডাব এর বর্তমান সংকট উত্তরণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পুনর্গঠনের পদক্ষেপ নেয়া[৩৮]।

এই ম্যান্ডেটকে সামনে রেখে জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। তাহমিনা আখতার, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ১৭৬।

২। Moursheda Habib, U.K.M. Shawkat Ara Begum and Md. Mustafa Kamal, *Women's Capacity in Action: Impact Analysis on Women's Capacity,* ASA, December, 1994, p.(i).

৩। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, অক্টোবর ২০০১, *নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন*, আশা, ঢাকা, পৃ iv

৪। *ASA Sustainable Micro-Finance Model*, ASA, Dhaka, p. 1

৫। বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০০১, আশা, পৃ ১৩।

৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৮।

৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৮।

৮। *ASA Self-Relient Development Model*, 1993, Dhaka, pp. 14-15

৯. *নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত*, পৃ (iv).

১০. *বার্ষিক প্রতিবেদন*, -২০০১, 'আশা', পৃ ২৮।

১১. তাহমিনা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮০।

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮০।

১৩. *বার্ষিক প্রতিবেদন* -২০০১, 'আশা', পৃ ২৮।

১৪. Dewan A.H. Alamgir, *Achieving Financial Viability by A Large Micro Finance Institution (MFI) : The Association for Social*

Dhaka University Institutional Repository

Advancement (ASA) in Bangladesh, Credit and Development Forum (CDF), Bangladesh, December, 1997.

১৫. Moursheda Habib, U.K.M. Shawkat Ara Begum and Md. Mustafa Kamal, *Op. Cit*, p.12.

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬-৭।

১৭. তাহমিনা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮২।

১৮. Md. Shafiqul Haque Chowdhury, *ASA Sustainable Micro-Finance Model,* ASA, July, 1996, Dhaka, Bangladesh, p.-3.

১৯. Dewan A.H. Alamgir, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫।

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬।

২১. Md. Shafiqul Haque Chowdhury, *প্রাগুক্ত*, পৃ 8।

২২. Adapted from Md. Shafiqul Haque Chowdhury, *প্রাগুক্ত*, পৃ 8।

২৩. Md. Shafiqul Haque Chowdhury, *প্রাগুক্ত*, পৃ 8।

২৪. Dewan A.H. Alamgir, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬।

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ 8।

২৬. Mostaq Ahmmed, *Key to Achieving Sustainability: Simple and Standard Microfinance Services of ASA,* ASA, Dhaka, Bangladesh, July, 2002, p.- 163.

২৭। Adapted from Dr. Mostaq Ahmmed , *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৯৫।

২৮। Nimal A. Fernando and Richard L. Meyer, ASA-The Ford Motor Model of Microfinance, Finance for the Poor, ADB, Quarterly

Dhaka University Institutional Repository

Newsletter of the Focal Point for Microfinance, June 2002, Vol. 3, No. 2, p.-1.

২৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ ২।

৩০। Rural Development in Bangladesh: A Case of ASA, Policy and Operations Evaluation Department, Netherlands Government, Association for Social Advancement (ASA), p. 19-20.

৩১। *বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৭-২০০১*, আশা, ঢাকা।

৩২। Khawja Shamsul Huda, Struggle and Achievement. 20 years of ADAB, Grassroots, Alternative development Journal, and ADAB Quaterly, July- Dec. 1994, Vol. IV, Issue-XIII-XIV, p.60.

৩৩। Ibid, p. 59.

৩৪। Ibid, p.60.

৩৫। Ibid, p.61.

৩৬। Ibid, p.62.

৩৭। দ্বিতীয় জাতীয় এনজিও কনভেনশনে উপস্থাপনের জন্য জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটির সংক্ষিপ্ত কর্ম প্রতিবেদন, পৃ ১।

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

নারী উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। আর এ প্রক্রিয়া তরান্বিতকরণে এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (আশা) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেননা স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়তশাসিত সংস্থাগুলোর গতানুগতিক, আমলাতান্ত্রিক ও অদক্ষতার ফলে যখন উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাংখিত সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তখন থেকেই মূলতঃ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এনজিও'র অংশগ্রহণ শুরু। আর সমাজের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৮ সনে দাতাদের অর্থানুকূল্যে সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে 'আশা' কাজ শুরু করলেও বিগত বছরসমূহে বিভিন্ন দিকে সংস্থার কার্যক্রম ক্রমাগত পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবস্থা বদলিয়েছে[১]। 'আশা' ঋণদান কার্যক্রম শুরু করে ১৯৮৯ সালে। এরপর ১৯৯২ সন থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নকে মূল ভিত্তি ধরে একটি আত্ম-নির্ভর টেকসই মডেলের সার্থক প্রয়োগ করে[২]।

স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন করার প্রত্যয় নিয়ে এনজিওদের যাত্রারম্ভ হলেও পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উন্নয়নের গতি, প্রকৃতি ও কৌশল যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি 'আশা'ও তার কৌশল পরিবর্তন করে একটি টেকসই উন্নয়নের ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিদেশী অনুদান নির্ভর উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে একটি আত্ম-নির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও প্রয়োগের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে[৩]। অর্থাৎ, 'আশা'র মূল লক্ষ্য দরিদ্র জনসাধারণ বিশেষ করে নারীর অবস্থার উন্নয়নে অনেকটা সক্ষম হয়েছে। 'আশা' ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০৯৯.৩৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যার মধ্যে শুধু ২০০১ সালেই ১৪,১৪,৯৩১ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে প্রায় ৯৯৬.৬৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ২০০১ সালের ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ১৩,৫৩,৯৯২ জনই নারী যা মোট ঋণ গ্রহীতার প্রায় ৯৬%[৪]। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন এসে যায় তা হলো ঋণ দারিদ্র বিমোচনে ও নারীর উন্নয়নে সক্ষম কি-না? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, সর্বপ্রথম বৃটিশ সরকার গরীব চাষীদের খরা, বন্যা, সাইক্লোন উত্তর পরিস্থিতিতে গ্রাম্য মহাজনদের খপ্পর থেকে বাঁচানোর জন্য ভর্তুকি দিয়ে ঋণ দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেও বহুকাল ধরে বাংলায় ঋণকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি অংশ হিসেবে দেখা হতো না; তবে গত এক শতক ধরে ঋণকে দারিদ্র, অশিক্ষা, শোষণ ও এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার হাতিয়ার হিসেবে পরিণত করা হয়েছে[৫]। বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌথ উদ্দ্যোগে ১৯-২১ মার্চ, ১৯৯৫ সালে শেরে-ই-বাংলা নগরস্থ পরিকল্পনা কমিশনের অডিটোরিয়ামে "ক্রেডিট ফর দ্যা পোওর" শিরোনামে আন্তর্জাতিক মানের এক কর্মশালায় গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও আর,ডি-১২ এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের যে সব সাফল্যের দিক ফুটে উঠেছে তাহলো ঋণ আদায়ের হার ৯০% এর উপরে, নারী সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে এবং নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় পরিবারগুলোতে সুখ-শান্তি ফিরে আসছে, বর্ধিত আয় দ্বারা ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ হচ্ছে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা ক্রয় করতে পারছে, পুষ্টিমান বাড়িয়েছে, দলীয় ব্যবস্থাপনায় কোন বন্ধকী ছাড়াই ঋণ নিচ্ছে, গ্রামীণ মহাজনদের দৌরাত্ম্য কমছে, নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি হচ্ছে, এবং সামাজিকভাবে তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা উর্ধ্বগামী হচ্ছে[৬]। অন্যদিকে যেখানে 'আশা'র ঋণ গ্রহীতার প্রায় ৯৬% নারী এবং ঋণ আদায়ের হারও প্রায়

১০০% সেখানে এ ঋণ যে, উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এবং তা যে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে একথা স্পষ্টভাবেই বলা যায়।

হোয়েনচেইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল ব্রান্ট্রাপ কর্তৃক পরিচালিত 'আশা'র উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও এর প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পরিচালিত এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার উল্লেখ্যযোগ্য কতিপয় হলোঃ[৭] (ক) 'আশা'র গ্রুপ মেম্বরদের ৬৫% দরিদ্র এবং চার বছরের বা তার অধিক সময়ের পুরাতন সদস্যরা প্রায় ৫০% এবং নতুন সদস্যরা প্রায় ২০% আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে; (খ) প্রায় ৯০% ঋণগ্রহীতা তাদের গৃহীত ঋণ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার নিশ্চিত করেছে; (গ) ঋণগ্রহীতার ৬৩% তাদের পরিবারে স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে; এবং ৮০% সদস্য পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে; (ঘ) 'আশা'র প্রায় ১০০% সদস্য নাম স্বাক্ষর করতে পারে, ৯৫% ওরস্যালাইন তৈরি করতে সক্ষম, ৯০% তাদের সন্তানদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা কর্মসূচীর আওতায় আনতে পেরেছে, ৫৫% তাদের অসুস্থতার সময় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারে; (ঙ) 'আশা'র সদস্যদের উন্নত ব্যবহার, আন্তরিক আচরণ এবং সংগঠনের অনুসৃত সহজ নিয়ম-কানুনের কারণে অন্যান্য এনজিও'র তুলনায় অধিক হারে ভূমিহীন দরিদ্র লোকদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে। আর এসব কিছুই ব্যক্তি বা সমাজ জীবনের ইতিবাচক দিক বলে অনায়াসেই মন্তব্য করা যায়। তবে 'আশা'র সমিতি সদস্যরা আশা'কে নারী বা দরিদ্রদের ভাগ্যোন্বেষণের উপায় হিসেবে না দেখে এটাকে তারা ঋণ পাবার উপায় হিসেবে দেখে সে ঋণ যতই অসুবিধাজনক নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আসুক না কেন, তাদের জীবনে এটা উপকারী[৮]।

'আশা' বিদেশী অনুদান নিয়ে তার কর্মকান্ড শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে স্বল্প-সুদে ফেরতযোগ্য মূলধন এবং সর্বশেষে বাণিজ্যিক হারে ঋণ নিয়ে সংস্থায় ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের যে স্থায়িত্ব দিচ্ছে তা হতে পারে অন্যান্য এনজিওদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত এবং ভবিষ্যতে

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের শেয়ারের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি করে 'আশা' উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় যে স্বপ্ন লালন করেছে তার সফল বাস্তবায়ন করতে পারলে তা হবে 'আশা' ও জনগণের জন্য টেকসই উন্নয়নের একটি পূর্ণতা[৯]।

এনজিও'দের বিভিন্ন কল্যাণমুখী ও আর্থিক কর্মকান্ড আজ অনেকের কাছে সমাদৃত হলেও এনজিও'রা পল্লী এলাকায় যে সেবা দেয় তা অনমনীয় এবং সংকীর্ণ[১০]। অনুরূপভাবে 'আশা'র কর্মকান্ডও যে সম্পূর্ণভাবে সমাদৃত একথা বলা যায় না। 'আশা'র কর্মকান্ডের আরো সুফল পেতে হলে যেমন আরো নমনীয়তা আনতে হবে তেমনি প্রয়োজন কর্মকান্ড আরো সম্প্রসারিত করা যাতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র নারী 'আশা'র কর্মসূচী থেকে আরো অধিক সুবিধা সহজেই পেতে পারে এবং নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমূহ বিভিন্ন উন্নয়নধর্মী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। যেমন- গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের মধ্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ণ ইত্যাদি। সামগ্রিক বিবেচনায় সমাজের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় এনজিও'র ভূমিকার প্রধান দিকগুলো হচ্ছেঃ (১) উন্নয়নের সক্রিয় প্রতিনিধি হিসাবে দরিদ্রদের সহায়তা করা; (২) উন্নয়নের আবশ্যকতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা; এবং (৩) যৌক্তিক চাপ প্রয়োগের মাধমে যথার্থ নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে প্রভাবিত করা[১১]। আর এসবের ব্যতিক্রম ঘটলেই এনজিও'র কার্যক্রম বিতর্কিত হয়ে পড়ে। এনজিওসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি এর নেতিবাচক দিকও রয়েছে। ইতিবাচক ভূমিকার মধ্যে রয়েছে এনজিওসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র নিরসন, অকৃষিখাতে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেয়ার সরকারী প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা থাকার কারণে এনজিও-এর ভূমিকা সরকার এবং আন্তজার্তিক সাহায্যদাতা সংস্থাসমূহ সকলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ[১২]। এছাড়া এনজিওসমূহ লাগসই প্রযুক্তির বিকাশ যেমন- আর.ডি.আর.এস. কর্তৃক বাঁশের নলকূপ, সৌর ড্রায়ার, এম.সি.সি. ও এম.এ.ডাব্লু .এ. কর্তৃক দাঁড় পাম্প ও তারা পাম্প ইত্যাদি লাগসই প্রযুক্তি নির্মাণে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি এনজিও সমূহেরও অনেক নেতিবাচক দিকসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অতিরিক্ত প্রশাসনিক ব্যয়, কর্মসূচীর ওভারল্যাপিং ও তা থেকে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি, অনাকাংখিত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা ও সূত্র থেকে বেআইনীভাবে অর্থ গ্রহণ এবং স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের ব্যয় ইত্যাদি। এজন্য "অভিন্ন লক্ষ্যের সন্ধানে সরকার ও উন্নয়নকামী এনজিওদের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদারকরণ" শীর্ষক সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুপারিশ করেছে যে, সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এনজিও'র কর্মসূচীতে অর্থ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে পারে[১৩]। আর এটা সম্ভব হলে এনজিওদের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা যেমন অনেকাংশেই দূর হবে তেমনি সরকার যদি এনজিও'র কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সহায়ক শক্তি হিসেবে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করে দেয় তবে তার ভিত্তিতে এনজিও কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক দিকসমূহের অবসান ঘটাতে পারে। তেমনি এনজিও সংশ্লিষ্টরাও আন্তরিক তৎপরতার মাধ্যমে এসব নেতিবাচক দিকসমূহের অবসান ঘটাতে পারে।

বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় কতিপয় সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা যার মাধ্যমে পরিবারে তার অবস্থান এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা নির্ধারিত হয় এরূপ একটি চলক হলো ভূমি বন্টন এবং ভূমির উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের নারী শিশুকাল থেকে বৈষম্যের শিক্ষার এবং বেশ কিছু সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বেড়ে উঠে যার দরুন নারীর উপর পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায়

Dhaka University Institutional Repository

তৎপর হয়। এতে অর্থনৈতিক সম্পদ পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতাদর্শ নির্ধারণ এবং এ প্রক্রিয়ায় নারীর অনুপস্থিতির কারণে পুরুষরা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কব্জা করে ফেলে[১৪]। ফলে নারীর সম্ভাবনাময় শক্তি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না এবং দেশও সম্ভাব্য উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে 'আশা'র মূল লক্ষ্য হলো এমনভাবে কর্মসূচী গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধাভোগী হবে নারী এবং যার ফলে নারীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন তথা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয় এবং যার ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক কাংখিত গতি মাত্রায় পৌঁছতে পারে।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পূর্বে এনজিওদের কর্মতৎপরতা তেমন লক্ষ্য করা যায়নি। বিশেষ করে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে এদেশে এনজিও কার্যক্রম শুরু হয়। মূলতঃ সে সময় থেকেই বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নিছক সেবামূলক ত্রাণ কর্মকান্ড থেকে উন্নয়নমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক অংশগ্রহণ শুরু করে এবং দিন দিন তাদের কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে[১৫]। বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমূহ বিভিন্ন উন্নয়নধর্মী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। যেমন-গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের মধ্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় সমাজের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় এনজিওর ভূমিকার প্রধান দিকগুলো হচ্ছেঃ (১) উন্নয়নের সক্রিয় প্রতিনিধি হিসাবে দরিদ্রদের সহায়তা করা; (২) উন্নয়নের আবশ্যকতা সম্পর্কে জণগণকে সচেতন করে তোলা এবং (৩) যৌক্তিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে যথার্থ নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে প্রভাবিত করা[১৬]। আর এসব কার্য পরিচালনা করার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানো এনজিওদের মূল লক্ষ্য হলেও তা সম্পন্ন করা অত্যন্ত জটিল। কেননা এসব কর্মকান্ড পরিচালনা করতে গিয়ে এনজিওদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে বলে অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনায় সমাজের কোন কোন স্তর থেকে বাধা সৃষ্টি করা হয়। এনজিওদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগের যথেষ্ট প্রমাণ যে পাওয়া যাবে না একথা বলা ঠিকও হবে না। এনজিওসমূহ প্রথমদিকে রাজনীতির সংগে নিজেদের জড়িত না করলেও বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের জড়িত করছে এবং একটি প্রেসার গ্রুপে পরিণত হচ্ছে যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯০ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে এনজিও সংস্থা কর্তৃক সরাসরি সমর্থন[১৭]। তবে ঢালাওভাবে অভিযোগ করাটা ঠিক হবে কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। ফলে এনজিওদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠলেও তা কতটা যৌক্তিক তা বিতর্কিত। একজন এনজিও ব্যক্তিত্বের মতে, তাঁদের দু'টি তরবারির ভিতর দিয়ে কাজ করতে হয়। কেননা তাঁরা যে সব কাজ করেন, যেমন-দারিদ্র বিমোচন, সুশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, সমাজের দুর্বল, দলিত শ্রেণীর মানবাধিকার সুরক্ষা, প্রগতির পক্ষে থাকা, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকার বিরোধিতা করা ইত্যাদি এর কোন কাজই অরাজনৈতিক নয়[১৮]। আবার অনেক ক্ষেত্রে সরকারই অনেক কাজ এনজিওদের মাধ্যমে করাতে চায়। এক্ষেত্রে তারা সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। এখানে সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর সচেতন-অনিবার্য অংশ হিসেবে এনজিও যখন সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তখন ক্ষেপে যায় সরকার। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আওয়ামী শাসন আমালে সরকার কর্তৃক বস্তি উচ্ছেদ এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় মৌলবাদীদের হামলা ইস্যু, বর্তমান বিএনপি'র বিগত শাসনামলের অর্থাৎ, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর পরিস্থিতি যখন আরো বিশৃংখলা, গৃহযুদ্ধ অথবা কোন সামরিক হস্তক্ষেপের দিকে যাচ্ছিল তখনও এনজিওদের সংগঠন এডাব অস্তিত্ব রক্ষার্থে তখন এক মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল[১৯]। তখন অবশ্য বিভিন্ন ব্যবসায়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনেরও অনুরূপ ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এনজিওদের ন্যায় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ জোরালোভাবে উথাপিত হয়নি। এনজিও ও সরকারের এরূপ অস্পষ্ট সম্পর্ক এনজিওদের স্বাভাবিক

কর্মকান্ডকে বাধাগ্রস্থ করে তোলে। এখানে উল্লেখ্য যে, এনজিওদের বা নির্দিষ্ট কোন এনজিও'র কর্মকান্ড যদি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের বিপক্ষে যায় তখনই তারা এনজিওদের এসব কর্মকান্ডের সমালোচনা করে এবং ঐ রাজনৈতিক দল যদি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তবে সংশ্লিষ্ট এনজিও'র কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল গ্রহণের প্রচেষ্টা চালায়। আবার ঐ একই এনজিও'র কোন কর্মকান্ড যদি তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষে যায় তবে তখন ঐ রাজনৈতিক দলের আর উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। ফলে বাংলাদেশে সরকার-এনজিও (GO-NGO relation) সম্পর্ক একটি দ্বান্দ্বিক (ambivalence) এবং নিঃস্পৃহ (indifference) পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলছে এবং তা কখনও কখনও পরষ্পরকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়[২০]। আর এরূপ পরিস্থিতি এনজিও কর্মকান্ডকে নানামুখী প্রতিবন্ধকতার দিকে ঠেলে দেয় যার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ শিকার হয় এনজিও নির্ভর বিভিন্ন দরিদ্র শ্রেণী এবং এনজিওতে কর্মরত অপেক্ষাকৃত নিম্নপদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। *এছাড়া, এনজিও ও সরকারের কর্মকান্ডের সমন্বয়হীনতা আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক যা এনজিও'র কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা যায়। *এনজিওদের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধকতার জন্য আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর সেই অংশ যারা গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর অঘোষিত বা ঘোষিত কর্ণধার। এদের একটা বড় অংশ নিজেদের স্বার্থেই চায় না দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়ন হোক। তাছাড়া এদেরই একটি অংশ যারা দাদন ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি তারা দরিদ্র শ্রেণীর প্রয়োজনের সময় সাহায্যের নামে উচ্চসুদে ঋণ দিয়ে থাকে। তাদের লক্ষ্য থাকে যাতে এই দরিদ্র শ্রেণী কর্তৃক গৃহীত ঋণ ও তার উচ্চসুদ পরিশোধ করতে না পারার সুযোগে ঋণ আদায়ের নামে তাদের শেষ সম্বল ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দখল করা। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এদের সাথে ফতোয়াবাজদের রয়েছে আশ্চর্যজনক মিল। বাংলাদেশে ফতোয়ার প্রকোপ ও মৌলবাদের বিকাশমান রূপ এবং এর ফলে মানবাধিকার লংঘন, বাক-স্বাধীনতার বিপর্যয় এবং নারী নির্যাতন প্রকট আকার ধারণ করছে[২১]। ফতোয়ার প্রথম ও প্রধান শিকার নারী। এদের কারণে অনেক নারী ইচ্ছা থাকা সত্বেও এনজিও কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের ভাগ্যের উন্নয়নের প্রচেষ্টা

চালাতে পারে না। এর সাথে যুক্ত হয় মৌলবাদীদের তৎপরতা। এই মৌলবাদীদের স্বরূপ সম্পর্কে মার্কিন গণমাধ্যমের অভিমত হলো মৌলবাদ হচ্ছে বিবেক বর্জিত, অশিক্ষিত, অসংস্কৃতিবান, সেকেলে, রক্তপিপাসু, নারী অবমাননাকারী, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত, রাজনৈতিক হতাশাগ্রস্থ, সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী এবং এর লক্ষ্য শান্তি প্রিয় গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানমনস্ক, নৈতিকতা সম্পন্ন, স্বচ্ছল নাগরিক[২২]। এসব ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদীরা এনজিও কর্মকান্ডকে বাধাগ্রস্থ করছে বলে অনেক গবেষকই মতামত প্রকাশ করে থাকেন। কেননা ফতোয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আক্রান্ত গ্রামাঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও এবং তাদের কর্মীবৃন্দ। এক্ষেত্রে এনজিও কর্মীদের কাজের প্রতি বিরোধিতা করা হচ্ছে বিভিন্ন ফতোয়াদানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ফতোয়ার শিকার হচ্ছে নারীরা যারা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল। ফতোয়ার নির্মমতার শিকার কয়েকটি অন্যতম ঘটনা হলো ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত বগুড়ার কাহালু থানার ২৬ জন যক্ষ্মা রোগীকে ব্র্যাকের চিকিৎসা নিতে (যার মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়) এই বলে বাধা দেয়া যে ব্র্যাকের ঔষধ খেলে খ্রীষ্টান হয়ে যাবে; প্রায় একই সময়ে জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্র্যাকের ২৫টি স্কুল পুড়িয়ে দেয়া; একই বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে জেলার ৫০টি গ্রামের ১০০ অন্তঃসত্ত্বা নারীকে ব্রাকের চিকিৎসা নিতে বাধা দেয়া; ২৩ মে, ১৯৯৪ তারিখে সিলেটের হরিপুর এলাকায় "গ্রাম উন্নয়ন বান্ধব" এর মাঠকর্মী রশিদকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করে তার মাথার চুল ছেঁটে দিয়ে জুতোপেটা করা ইত্যাদিসহ রাজধানী ঢাকা শহরেই দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ, অধ্যাপক ড. কবীর চৌধুরীসহ অনেককে মুরতাদ ঘোষণা ও ফাঁসি দাবী করা হয়[২৩]। প্রায় অনুরূপ চিত্র বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র যা দেশের এনজিও কর্তৃক দেশের অসহায়-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ডে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে এসব ফতোয়াদানকারীরা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। এনজিও কর্মকান্ড এসব ক্ষমতাবানদের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থি এবং আঘাতস্বরূপ। কারণ মওলানাদের আয়ের উৎস পানি পড়া, তাবিজ-কবজ দান, মিলাদ পড়া, এনজিও নারী কর্মীরা এনজিওগুলোর মাধ্যমে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সুবিধা লাভ করছিল এবং এসব

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে চেতনাকে প্রভাবিত করছিল কিন্তু এনজিও কর্মকান্ডের ফলে মওলানাদের উপরিউক্ত উৎস থেকে আয়ের পথ সংকুচিত করাসহ মওলানাদের গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের টাকা কর্জ দেয়ার যে অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসা বিদ্যমান ছিল তাকে সংকুচিত করছিল[২৪]। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রামের স্বচ্ছল ব্যক্তি যারা দরিদ্রদের সাহায্যের নামে উচ্চ সুদে ঋণের ব্যবসা করতো তাদের এই ব্যবসা বা স্বার্থে এনজিও কর্মকান্ড আঘাত হানার কারণে তারাও এসব ফতোয়াদানকারীদের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ফলে ফতোয়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকটির প্রভাবে এনজিও'র কর্মকান্ড পদে পদে বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

এনজিওদের সম্পর্কে আরেকটি অভিযোগ হলো এরা সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করছে। এই সংগঠনগুলোর তৎপরতার পরিবর্তন বিরোধী দিকটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং সেই সাথে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে বাংলাদেশে এনজিওদেরকে একটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সব রকম সাহায্য দিচ্ছে[২৫]। ১৯৯২ সনের জুলাই মাসের শেষ দিকে এনজিও ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক গোপন রিপোর্ট পাঠায়। ঐ রিপোর্টে বহু উল্লেখযোগ্য এনজিওকে অবৈধ কাজের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল শীর্ষ স্থানীয়সহ প্রায় ৫০টি এনজিও সরকারী অনুমতি ছাড়াই প্রায় ১৪০ কোটি টাকার সমমূল্যের বৈদেশিক তহবিল সংগ্রহ করেছে এবং কয়েকটি এনজিও ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করছে। এনজিওগুলো এসব টাকা ব্যয় করে কর্মীদের অধিক বেতন দিয়ে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী ব্যবহার করে[২৬]। এরূপ অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনমনে এনজিও সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে এবং এনজিও বিরোধীদের প্রচারণাকে আরো শক্তিশালী করে। ফলে এনজিও কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে এনজিও সংগঠনসমূহের ভিতরের কাজকর্ম, জনশক্তির ব্যবহার-অপব্যবহার, তাদের মজুরী-মূল্যায়ন বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এনজিও বিষয়ক এক গবেষকের মতে, মূলত: বাংলাদেশের গ্রাম জনপদের নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের

ছেলেমেয়েরাই এখানে এনজিও ভিত্তিকে আজকের শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে এসেছে। এখানে নিজের কর্মসংস্থান, রুটি-রুজির পাশাপাশি তার শ্রেণীর জন্য কিছু একটা করার ঐকান্তিক ইচ্ছাও ছিল সুপ্ত আকাংখার-পরিকল্পনার ভিতর। কিন্তু আজ সে তার সেক্টরে হয়ে যাচ্ছে উপেক্ষিত-বঞ্চিত। দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষমতায়নের চিন্তাটিও সেজন্য আজ স্তিমিত হয়ে পড়ছে এনজিও সংগঠনের ভিতরেই। আগে যেটি ছিল সার্ভিস সেক্টর, এখন সেটিই হয়ে উঠছে বিশেষ সুবিধাবাদী শ্রেণীর এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর[২৭]। বিরাজমান এরূপ অবস্থার কারণে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করা অনেকটাই গৌণ হয়ে পড়েছে। এর জন্য মূলত: কিছু উচ্চাভিলাষী এনজিও কর্মকর্তা দায়ী।

এনজিওদের কর্মকান্ড পরিচালনার আর একটি প্রতিবন্ধকতা হলো প্রদত্ত ঋণের উপর উচ্চ হারে সুদ। বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সুদের হারে ভিন্নতা রয়েছে এবং তা ১২% থেকে ১৮% এর মধ্যে বলা হলেও প্রকৃত সুদের হার অনেক বেশি। কেননা বিভিন্ন এনজিও ঋণ গ্রহীতাকে যে পরিমাণ ঋণ দেয় তা আবার ২/৩ সপ্তাহ পর থেকে কিস্তিতে সুদসহ আদায় করে নেয়। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ঋণ প্রদানের ২/৩ সপ্তাহ পর থেকে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হলেও প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণের উপর পুরো সময়ের সুদ কিস্তির সাথে আদায় করা হয়। ফলে প্রকৃত সুদের হার প্রদর্শিত হারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়ায় যদিও তা যে কোন অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার অপেক্ষা অনেক কম। ফলে ঋণগ্রহীতা এরূপ ঋণ নিয়ে কতটা লাভবান হতে পারে এবং এনজিওদের মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র বিমোচন কতটা অর্জিত হচ্ছে তা প্রশ্নের সম্মুখীন।

কিছু কিছু এনজিও'র কিছু কর্মকান্ডও এনজিওদেরকে বিতর্কিত করে তুলছে। যেমন- ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় ঋণ না দিয়া, ঋণ গ্রহীতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল বা সামাজিকভাবে হয়রানি করা ইত্যাদি। এর ফলে এনজিও সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। এরূপ নেতিবাচক ধারণা পুরো এনজিও কার্যক্রমকে এনজিও বিরোধীদের তোপের মুখে ফেলে দেয় এবং সার্বিক কার্যক্রমকে করে তোলে বাধাগ্রস্থ।

এনজিও'র কর্মসূচী বাস্তবায়নে আর একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো কর্ম এলাকা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত সমস্যা। দ্রুত এনজিও'র সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক শহরে-বস্তিতে এবং বিস্তৃত গ্রামীণ জনপদে কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে গিয়ে ওভারল্যাপিং (Overlapping) এবং ডুপ্লিকেশন (Duplication) এর মত কর্ম এলাকাগত সমস্যা আজ ক্রমান্বয়ে জটিল রূপ ধারণ করছে[২৮]। ফলে বাস্তবে দেখা যায় যে, একজন সদস্য একাধিক এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে ঋণের বোঝা ভারী করে, ঋণ পরিশোধ না করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে যেমন- দলের মধ্যে অবিশ্বাস ও অনৈক্য সৃষ্টি করে, ঋণদানকারী এনজিও সম্পর্কে এলাকার জনমনে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন এনজিও পর্যায়ে বাড়ছে অনৈক্য, কর্মী পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি চলছে জাতীয়, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের মধ্যে ছোট, মাঝারি এবং বড় ভেদাভেদ নিয়ে এবং এ থেকে সৃষ্ট তিক্ততা এবং অনৈক্যর সুযোগ গ্রহণ করছে চতুর দলীয় সদস্য/সদস্যাগণ ও প্রতিক্রিয়াশীলতা, সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিবাদে জড়িত প্রত্যেকটি এনজিও যার কারণে যে সমস্ত কর্ম এলাকায় এনজিওদের মধ্যে এ ধরনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অসন্তোষ চলে এসেছে সেখানে কোন্দলে জড়িত প্রত্যেকটির এনজিও'র কার্যক্রমের পারফরমেন্স কমে যাচ্ছে[২৯]। আর এসবের প্রভাবে এনজিও'র কার্যক্রম কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, এনজিও'র সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সত্যিকার সুবিধা প্রত্যাশীরা।

এনজিওদের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হলো, তারা বেআইনীভাবে দেশী সংস্থা ও সূত্র থেকে অর্থ গ্রহণ করে এবং স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রেই বেশি আগ্রহী। আর তারজন্য সরকারকেও সুকঠিন হাতে এনজিওদের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর
৮ পাশাপাশি আর্থিক সংকটও অনেক এনজিও'র রয়েছে। অনেক সময় দারিদ্র বিমোচন, নারীর

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা, সচেতনতা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে দেশী-বিদেশী উৎস থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা বা অনুদান পাওয়া যায় না। এজন্য "অভিন্ন লক্ষ্যের সন্ধানে সরকার ও উন্নয়নকামী এনজিওদের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদারকরণ" শীর্ষক সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুপারিশ করেছে যে, সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এনজিও'র কর্মসূচীতে অর্থ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে পারে[৩০]। আর এটা সম্ভব হলে এনজিওদের আর্থিক সংকট ও প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশেই দূর হবে।

এনজিও'র কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তাহলো এনজিও'র মূল লক্ষ্য অর্জন অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। এর জন্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কিছু দুর্বলতা বা অনিয়ম যেমন দায়ী তেমনি প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত অনেক বিষয়ও জড়িত। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা যায়ঃ

১। এনজিও'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নীতিমালার। এই নীতিমালা এমনভাবে প্রণীত হতে হবে যাতে এনজিও কর্তৃক ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয় এবং দেশের স্বার্থ পরিপন্থি কোন কর্মকান্ডে যাতে জড়িত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অর্থ্যাৎ, নীতিমালা হবে এনজিও'র সহায়ক ও সুষ্ঠুভাবে এবং কাংখিত উপায়ে পরিচালনার জন্য; এনজিও'র স্বাভাবিক কাজকর্ম বাধাগ্রস্থ করার কৌশল হিসেবে নয়।

২। সরকার ও এনজিও পরস্পরকে পরস্পরের সহায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করা উচিত। পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত না হয়ে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে সম্মিলিত উদ্যোগের দ্বারা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নিরসনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনসহ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। এজন্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকার নিজেই সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের অঙ্গীকারাবদ্ধ না

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এনজিওদের সচেতনতা বৃদ্ধি মডেল অনিবার্যভাবেই সরকারী সংস্থা সমূহকে ঝামেলার মধ্যে ফেলে দেবে[৩১]।

৩। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা পরিহার এনজিও'র কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের অন্যতম একটি উপায়। এনজিও'র লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়। কোন কোন এনজিও বা তার কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে অহেতুক বিতর্কে জড়ানো অনাকাংখিত ও অপ্রত্যাশিতও বটে। তবে নিরপেক্ষভাবে তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কেহ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তোলে সেক্ষেত্রে সমাজের সচেতন নাগরিক, গোষ্ঠী, সংগঠনসহ সকল মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন বিজ্ঞান মনস্কদের এনজিওদের সহায়তায় এগিয়ে আসা উচিত।

৪। ফতোয়াদানকারী ও মৌলবাদীদের দ্বারা এনজিও'র কর্মকান্ডে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর করার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি। এনজিওরা যে দেশের তথা দরিদ্র জনসাধারণ বিশেষ করে নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ও জোড়ালোভাবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও গণ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে হবে। এরূপ প্রচারণা যদি দেশের বিজ্ঞান মনস্ক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের দ্বারা পরিচালনা করা যায় তবে তা অধিক ফলপ্রসূ হবে বলে গবেষক মনে করেন। এ ব্যাপারে সরকারসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে।

৫। এনজিও'র কর্ম এলাকা চিহ্নিতকরণে ডুপ্লিকেশন এবং ওভারল্যাপিং সংক্রান্ত যে প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা রয়েছে তা দূর করার জন্য সরকারের পাশাপাশি এনজিওসমূহের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতি থানায় সম্ভব না হলেও অন্তত প্রতিটি জেলায় একটি করে মনিটরিং সেল স্থাপন করা যেতে পারে। এদের কাজ হবে যাতে স্ব-স্ব জেলায় বিভিন্ন এনজিও'র কর্মসূচীর ডুপ্লিকেশন বা ওভারল্যাপিং না হয় তা

তদারকি করা। ফলে বিভিন্ন এনজিও'র মধ্যে রেষারেষি, অনৈক্য হ্রাসসহ সুবিধাভোগীদের মধ্যে চাতুর্যতার আশ্রয় নেয়ার প্রবনতা বন্ধ হবে বা হ্রাস পাবে।

৬। দেশের অর্থনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় হ্রাস করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি, অফিস ব্যবহার পরিহার করে কাজের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মাত্রায় এসব ব্যবহার করতে হবে।

৭। এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সুদের হার এমনভাবে নির্ধারণ করতে যাতে সুদের হার কমে আসে এবং প্রকৃত ও প্রদর্শিত সুদের হারে কোন পার্থক্য না থাকে। এর ফলে দরিদ্র ঋণগ্রহীতা ঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজে লাভবান হতে পারবে।

উপরিউল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত হলে এনজিও সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা অনেকখানি নিরসন হবে। এনজিওদেরকে যতই সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট বা বুর্জোয়া রাজনীতির সহায়তাকারী ইত্যাদি বলা হোক না বর্তমানে এনজিওসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই বলা যায় বাংলাদেশে এনজিওগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এসব সংস্থার প্রতি আন্তর্জাতিক সাহায্য দাতা সংস্থা ও সরকারের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপ করা থেকে এটা উপলব্ধি করা সম্ভব যে বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এনজিও মডেল তাদের সকলের সর্বজন গৃহীত পথ ও পদ্ধতি[৩২]। বিদেশী সাহায্য নির্ভর বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীকে যেমন উপেক্ষা করা যায় না তেমনি নেতিবাচক ও বিতর্কিত বিষয়সমূহকে সরকার ও এনজিও প্রতিনিধিদের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত।

অন্যান্য এনজিও'র ন্যায় 'আশা'র কর্মকান্ডেও এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্বেও কর্মকান্ড জাতীয়ভাবে সমাদৃত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই 'আশা'র কর্মসূচী, মডেল, পদ্ধতি ও কর্মীদের গতিশীল নেতৃত্বের কারণে 'আশা'র ন্যায় অনুরূপ কর্মসূচী আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, জর্দান, ইথিওপিয়া, ভারত, ফিলিপাইনস এবং

Dhaka University Institutional Repository

নাইজেরিয়াতে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে[৩৩]। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আশা'র ন্যায় অনুরূপ কর্মসূচী দারিদ্র-পীড়িত আরো অনেক দেশে চালু হবে এবং তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের দরিদ্র জনসাধারণ প্রত্যাশিত মাত্রায় সেবা গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণ বিশেষ করে নারীরা নিজেদের বিভিন্ন দিকের উন্নয়নের মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে ও দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কোন সমাজ বা দেশ কাংখিত উন্নতি লাভ করতে চাইলে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান গুরুত্ব প্রদান করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর এজন্যই বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশ তার বর্তমান অবস্থান থেকে যদি উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় তবে অবশ্যই নারী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যম অগ্রসর হতে হবে। নারীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত করতে হবে এ কারণে যে, বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নারীর অবস্থান পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। তাই স্বল্প-ময়াদী বা মধ্য-মেয়াদের জন্য হলেও নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে পুরুষের অবস্থানের সমান পর্যায় বা কাছাকাছি পর্যায় নিয়ে আসতে হবে যাতে তারা পুরুষের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি দেশে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও'রা যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের জন্য সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তেমনি দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশীদার হিসেবে এনজিও'রা যাতে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে না পারে সে ব্যাপারেও যেমন সরকার সহ বিভিন্ন সচেতন মহলের সতর্ক থাকতে হবে তেমনি কোন স্বার্থন্বেষী মহল বা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর অসত্য প্রচারণার ফলে যাতে এনজিও'র কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ না হয় সেদিকে সচেতন মহল ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সজাগ থাকতে হবে। আর এটা সম্ভব হলেই দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১। মোঃ এনামুল হক, *দারিদ্র বিমোচন ও তৃণমূলে উন্নয়ন,* আশা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ ১১৬।

২। *দৈনিক সংবাদ,* ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

৩। *দৈনিক বাংলা বাজার,* ২২ জানুয়ারি, ১৯৯৬।

৪। *বার্ষিক প্রতিবেদন* - ২০০১, আশা, ঢাকা।

৫। স্টুয়ার্ড রাদারফোর্ড, *আশা একটি এনজিও'র আত্ম-কাহিনী,* শিরিন রহমান (সম্পাদিত), আশা, ঢাকা, ২০০১, পৃ ১৫।

৬। মোঃ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত,* পৃ ২৬-২৮।

৭। *বার্ষিক প্রতিবেদন* - ১৯৯৭, আশা, ঢাকা।

৮। স্টুয়ার্ট রাদারফোর্ড, *প্রাগুক্ত,* পৃ ৮৩।

৯। মোঃ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত,* পৃ ১১৭।

১০। স্টুয়ার্ড রাদারফোর্ড, *প্রাগুক্ত,* পৃ ৯৮।

১১। *Larry Minear, "The Role of Non-Governmental Organizations in Development",* Edward Clay and John Shaw (ed.) *Poverty, Development and Food (London, 1987), p. 213.*

১২। আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল,* প্রচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ ৪৮।

১৩। আনু মাহমুদ, *বাংলাদেশে এনজিও: দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন,* হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। Salma Khan, *The Fifty Percent Women in Development and Policy in Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 1993, p. 132.

১৫। আনু মাহ্মুদ, *বাংলাদেশে এনজিও: দ্রারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ ৯।

১৬। Larry Minear, *"The Role of Non-Governmental Organizations in Development",* Edward Clay and John Shaw (ed.) Poverty, Development and Food (London, 1987), p. 213.

১৭। আনু মাহ্মুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫২।

১৮। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৫ মার্চ, ২০০২, পৃ ৪।

১৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪।

২০। সৈয়দ এম. হাশেমী, এনজিওদের জবাবদিহিতাঃ উপকারভোগী, দাতা ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষিত, *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা- ৭, জানু-মার্চ, ১৯৯৭, পৃ ৪২।

২১। সুরাইয়া বেগম, বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং নারীঃ একটি পর্যালোচনা, মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম এবং হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি গ্রন্থ* থেকে সংকলিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ১৪৭।

২২। ফাতিমা মার্নিসি, মৌলবাদী আবিষ্টতায় নারীঃ আধুনিক মুসলিম সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের একটি প্রকাশ, *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, সংখ্যা-৪৫, ১৯৯২।

২৩। সুরাইয়া বেগম, বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং নারীঃ একটি পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০-১৫১।

২৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫২।

২৫। বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ ৯০।

২৬। সৈয়দ এম. হাশেমী, *বাংলাদেশে সরকার ও এনজিও সমূহ: সহাবস্থান, বিরোধ এবং সহযোহিতা*, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

২৭। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৫ মার্চ, ২০০২।

২৮। এন. আই. গালিব, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও : সম্পর্ক উন্নয়ন প্রসঙ্গে, *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ২য় বর্ষ, সংখ্যা- ৬, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭, পৃ ১১৯।

২৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২০।

৩০। আনু মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৪।

৩১। সৈয়দ এম. হাশেমী, এনজিওদের জবাবদিহিতাঃ উপকারভোগী, দাতা ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৫।

৩২। আনু মুহাম্মদ, *প্রাগুক্ত* , পৃ ১৪৩।

৩৩। *বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০০১*, আশা, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃঃ- ২৩।

Biblography/ গ্রন্থপঞ্জী

১। Aditee Nag Chowdhury, *Let Grassroots Speak: Peoples Participation, Selfhelf -Groups and NGO's in Bangladesh,* University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 1990.

২। ASA Self Relient Development Model, ASA, 1993, Dhaka, Bangladesh.

৩। ASA Sustainable Micro-Finance Model, ASA, Dhaka, Bangladesh

৪। Bangladesh - *Key Challenges in the Next Millennium* - World Bank, Dhaka, Bangladesh, 1999.

৫। Black, *The Dynamics of Modernization,* New York, 1966

৬। *Bureaucratic Elites in Segmented Economic Growth: Bangladesh and Pakistan,* University Press Limited, 1980, Dhaka, Bangladesh, 1980.

৭। Caroline O.N, Moser Third World: Meeting Practical and Strategic Needs - in Rebecca Grant and Kathlen, Gender Planning in the Newland (ed.) Gender and International Relations, Open University Press, 1991

৮। Credit Program for Urban Women Entrepreneurs : The Women's Small Business Assistance Centre (WSBAC) of the World Concern Bangladersh.

৯। David Apter, *The Politics of Modernisation,* The University of Chicago Press, Chicago, USA.

১০। Dr. Sayeda Rowshan Quadir, *Women Leaders in Development Organizations and Institutions,* Palok Publishers, Dhaka, Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

১১। Edward Clay and John Shaw (ed.), Larry Minear, *The Role of Non-Governmental Organization in Development"*, Poverty, Development and Food (London, 1987).

১২। *Flexible Financial Services for the Poor : The Bangladesh Unemployed Rehabilitation Organization* - Tangail (BURO - Tangail) in Bangladesh, Bangladesh.

১৩। Gabriel. A. Almond and Bingham Powell, *The Comparative Politics: A Developmental Approach,* Boston, Little Brown, 1966.

১৪। Leach Mark (1993) : Building Capacity Through Action Learning - A Paper Written ALED (Action Learning : Education for Development) Institute for Development Research (IDR).

১৫। Lucian W. Pye, *Aspects of Political Development,* Boston, Little Brown, 1966.

১৬। Mahfuz (1990) Bangladesh : *Communication in Development and Human Rights in Asia,* Edited by Hamelink, E and Meheru A : Asian Mass Communication Centre, Singapore.

১৭। Mahmuda Islam, *Women's Organizations and Programs for Women - Situation of Women in Bangladesh,* Women for Women, Dhaka, Bangladesh, 1979.

১৮। Md. Anisur Rahman (1994) : *People's Self Development: Perspective on Participatory Action Research - A Journey Through Experience,* The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh.

১৯। Md. Shadat Hossain (1992) : *Women and Men in Bangladesh - Fact and Figures,* 1992, An Executive Summary from Bangladesh Bureau of Statistics.

২০। Mohiuddin Ahmad, *Bangladesh In the New Millennium,* Community Development Library, Dhaka, Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

২১। Mostaq Ahmmed, *Key to Achieving Sustainability :Simple and Standard Microfinance Services of ASA,* ASA, Dhaka, Bangladesh.

২২। Moursheda Habib, U.K.M Shawkat Ara Begum and Md. Mustafa Kamal, *Women's Capacity in Action : Impact Analysis on Women's Capacity,* ASA, Dhaka, Bangladesh, December, 1994.

২৩। Naila Kabir, *Reversed Realities, Gender Hierarchies in Development Thought,* Verso, London, New York.

২৪। Nazma Chowdhury, *Women in Development : A Guide book for Planners,* Dhaka, Bangladesh, 1994.

২৫। Organaski, *The Stages of Political Development,* New York, 1956.

২৬। Poverty Alleviation Through Micro Credit and Agricultural Programs: The Gono Kallyan Trust (GKT) in Bangladesh.

২৭। Raunaq Jahan , *Pakistan Failure in National Integration-,* University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 1977.

২৮। Raunaq Jahan, *Women in Bangladesh,* Women for Women, Dhaka, Bangladesh.

২৯। Reaching the Urban Poor with Credit Service : The Urban Poor Development Program (UPDP) of Proshika in Bangladesh.

৩০। Rehman Sobhan, Nasreen Khundker, *Gobalization and Gender,-* University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 2000.

৩১। Rounaq Jahan, *The Elusive Agenda, Mainstreaming Women in Development,* University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 1994.

Dhaka University Institutional Repository

৩২। Salma Khan, *The Fifty Percent Women in Development and Policy in Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 1993.

৩৩। Samuel P. Huntington, *Political Development and Political Decay,* 1966

৩৪। Second Five Year Plan, Planning Commission, Govt. of Bangladesh, 1980-85.

৩৫। Sigmund Newman (ed.), *Modern Political Parties,* The University of Chicago Press, Chicago, 1956.

৩৬। Sultana Hajera (1994) : A Seminar Paper on Women in Politics, Organized by Dhaka Business & Professional Women's Club, Dhaka, Bangladesh.

৩৭। *The Global Replication of the Grameen Bank Approach: The Role of Grameen Trust,* Dhaka, Bangladesh.

৩৮। *The Stages of Economic Growth : A Non-Communist Manifesto,* Cambridge University Press.

৩৯। *The United Nations and the Advancement of Women (1945-1995),* United Nations, Blue Books Series, New York.

৪০। Wood Geofrey D., *Bangladesh: Whose Ideas, Whose Interests?*, University Press Limited, 1994, Dhaka, Bangladesh.

৪১। Yasmeen, *A Real Picture of Women, Work and NGOs,* CDL, Dhaka, Bangladesh.

৪২। আজিজুল হক, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও গণতন্ত্র,* ঢাকা কম্পিউটার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ ১৯৯২।

৪৩। আতিউর রহমান, *বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম,* প্রবর্তক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। আনু মাহমুদ, *উন্নয়ন উচ্ছ্বাস ও তৃতীয় বিশ,* মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

৪৫। আনু মাহমুদ, *বাংলাদেশে এনজিও: দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন,* হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৮।

৪৬। আনু মুহাম্মদ, বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং বাংলাদেশের অনুন্নয়ন, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

৪৭। আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল,* প্রচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

৪৮। আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি,* রংপুর টাউন স্টোর্স, ১৯৯৫।

৪৯। আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০২।

৫০। খান জামিল উদ্দিন, *উন্নয়নে সাহায্য সংস্থার ভূমিকা,* ত্রি-ধারা প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

৫১। জাতিসংঘ, ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন: ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৫২। জিয়াউল ইসলাম, *আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতি,* মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৯।

৫৩। নাজমা চৌধুরী, *নারী ও উন্নয়ন,* উইমেন ফর উইমেন,ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

৫৪। বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি,* জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

৫৫। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং জরিনা রহমান খান, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন,* সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

৫৬। তাহমিনা আখতার, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭। নাজমা চৌধুরী (সম্পাদিত), *নারী ও রাজনীতি,* উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

৫৮। নাজমা চৌধুরী ও হামিদা আখতার বেগম, *ইউনিয়ন পরিষদে নারী : প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন,* উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

৫৯। ফাওজিয়া খন্দকার ইভা, বাংলাদেশে জেন্ডার নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এনজিওসমূহের ভূমিকা, জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালা কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন, জেন্ডার ট্রেইনার কোর গ্রুপ - ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৮।

৬০। বেবী মওদুদ, *বাংলাদেশের নারী,* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৪।

৬১। মাহবুব-উল-হক, *উন্নয়ন অন্বেষণ,* পলক পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৯।

৬২। মুহাম্মদ সামাদ, *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্রমোচনে এনজিও'র ভূমিকা,* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

৬৩। মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম, হাসিনা আহমেদ, *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি,* সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৭।

৬৪। মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, *নারী, রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ,* সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

৬৫। শাহীন রহমান (সম্পাদিত), *জেন্ডার প্রসঙ্গ* , স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৮।

৬৬। সালমা খান, *সিডও এবং বাংলাদেশ,* স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৭।

৬৭। সিদ্দিকী কামাল, *বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র - স্বরূপ ও সমাধান,* ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৬৮। সিদ্দীকী শওকত আলম, নুরুল ইসলাম, মোঃ সাদেকুর রহমান সম্পাদিত *এনজিও: উত্তম নীতি এবং পদ্ধতি নির্দেশিকা,* কমনওয়েলথ এনজিও লিয়াজো ইউনিট, বাংলাদেশ, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৬৯। সিরাজুল ইসলাম, *সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন*, বুক সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯০।

৭০। সেলিম জাহান, প্রসঙ্গ : উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

৭১। সৈয়দ এম. হাশেমী, *বাংলাদেশে সরকার ও এনজিওসমূহ: সহাবস্থান, বিরোধ এবং সহযোগিতা*, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

৭২। স্টাইলস কিনডাল, "এনজিও সাহায্য দাতা সংস্থা এবং বাংলাদেশের রাজনীতি", বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি, তারেক শামছুর রহমান (সম্পাদিত) উত্তরণ, ঢাকা, ২০০০।

৭৩। হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রঃ সমস্যা ও করণীয়*, বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯১।

৭৪। হাসানউজ্জামান চৌধুরী, *সমাজ ও উন্নয়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

৭৫। হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশে এনজিও*, প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৬।

জার্নাল/সাময়িকী/পত্রিকাঃ

১। New Vision, A House Journal of ASA, Vol.-29, June 2001.

২। NGO Approach: Is It a Formal Theory of Development, Research and Evaluation Division, BRAC, Dhaka, September 1989.

৩। Nimal A. Fernando and Richard L. Meyer, ASA - The Ford Motor Model of Microfinance, Finance For the Poor, ADB, Quarterly News-Letter of the Focal Point for Microfinance, June, 2002, Vol. 3, No. 2.

৪। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, অক্টোবর ২০০১, *নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন*, আশা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৫। *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

৬। *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭।

৭। *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা-১০, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

৮। *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা-১৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

৯। *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ৫ম বর্ষ, সংখ্যা-১৫, জানু-মার্চ, ১৯৯৯।

১০। *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ষ্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ৫ম বর্ষ, সংখ্যা-১৮, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

১১। *উবিনীগ কর্মশালা* (৮ম কর্মশালা) প্রতিবেদন, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৮৬

১২। *জাতিসংঘ সংবাদ*, ৭ম বর্ষ, সংখ্যা-৭, জুলাই ১৯৯৫, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা।

১৩। *জাতিসংঘ সংবাদ*, মার্চ ১৯৯৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা-৩, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৪। *জাতিসংঘ সংবাদ*, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা- ৪ ও ৫, এপ্রিল- মে ১৯৯৭, ঢাকা।

১৫। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৯ নভেম্বর, ২০০১।

১৬। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৫ মার্চ, ২০০২।

১৭। নারী ও উন্নয়নঃ প্রবণতা, দর্শন ও প্রয়োগ, *প্রথম কর্মশালা, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা*।

১৮। *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ*, জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), জাতিসংঘ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। *বার্ষিক প্রতিবেদন*- ১৯৯৭, আশা, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

২০। *বার্ষিক প্রতিবেদন*- ১৯৯৮, আশা, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

২১। *বার্ষিক প্রতিবেদন*- ১৯৯৯, আশা, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

২২। *বার্ষিক প্রতিবেদন*- ২০০০, আশা, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

২৩। *বার্ষিক প্রতিবেদন*- ২০০১, আশা, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

২৪। *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা-২২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২৫। *ক্ষমতায়ন*, উইমেন ফর উইমেন , সংখ্যা-১, ১৯৯৬